প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৩ ❖ ১১ - ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ক্রুশ : শুরু ও সমাপ্তি

পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব

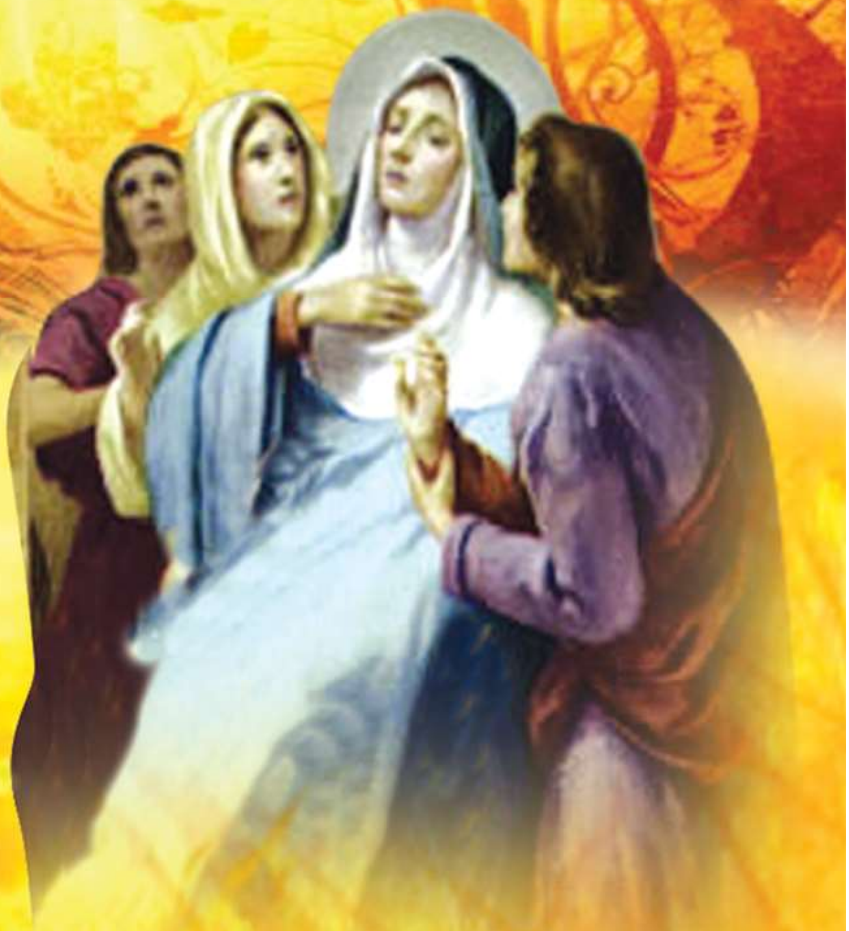

শোকার্ত জননী মারীয়া

শোকের সুখে

নিভে গেল এসএমআরএ পরিবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র
শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজা

এসএমআরএ পরিবারের একটি বিশেষ নাম, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সিস্টার মেরী তেরেজা। উণনব্বইটি বছর ধরে পরিবার ও সংঘের আকাশে জ্বলে জ্বলে গত ২৭ আগস্ট, ২০২২ রোজ শনিবার বিকাল পৌনে তিনটায় নিভে গেল। যে নক্ষত্রটির উদয় হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৩১ আগস্ট, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর নিভৃত এক পল্লী পিপ্রাশৈর গ্রামে। পিতা: গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং মাতা: মিটিল্ডা কোড়াইয়া আদর করে নাম দিয়েছিলেন সন্ধ্যা মারীসেলিন কোড়াইয়া। যৌথ ও আধ্যাত্মিক পরিবারের ভালোবাসা এবং শাসনে বড় হওয়ার কারণে সবার প্রতি ভালবাসায় ছিলেন পরিপূর্ণ। আর তাইতো ঈশ্বর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ঈশ্বরের সেবা করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে ১৯৫১ খ্রিস্টবর্ষের ৪ আগস্ট সংঘে যোগদান করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি পবিত্র পোশাক প্রাপ্ত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি চিরব্রত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সময়ের পূর্ণতায় রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী খুবই আনন্দ চিত্তে উদ্‌যাপন করেন।

প্রথম ব্রত গ্রহণের পর তুমিলিয়া প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি আইএ ও বিএ পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সেন্ট মেরীস স্কুল তুমিলিয়াতে শিক্ষকতা করেন। একই সাথে তিনি তার বিভিন্ন পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সংঘের প্রয়োজনে তৎকালীন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসির (ঈশ্বরের সেবক) পরামর্শে এবং মাদার আগ্নেশের নির্দেশনায় ফিলিপাইনে তিনবছর ঐশতত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ফিলিপাইন থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে আসার পর নব্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি একসাথে তিনটি দায়িত্ব পালন করেন। নব্যা পরিচালিকা, মাতৃগৃহের পরিচালিকা এবং সংঘের সহ সংঘ কর্ত্রী হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। সংঘের দুর্যোগপূর্ণ কঠিন মুহূর্তগুলোতে তিনি সংঘকর্ত্রীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে সংঘকে নতুন রূপদানে ব্রতী ছিলেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাতবছর নব্যাকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ প্রথম বারের মত সংঘকর্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার সংঘকর্ত্রী নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোট ১২ বছর শক্ত হাতে সংঘের হাল ধরে সংঘকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার সহ সংঘকর্ত্রী হিসেবে আরো ৬ বছর সংঘ পরিচালনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি জুনিয়র মিস্ট্রেস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সম্মিলনীর (বিসিআর) প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সেবা দিয়েছেন। পরপর দুইবার এ সেবা কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের জীবনের দিকে তাকালে দেখি তিনি সত্যিই সংঘের জন্য ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, এক শক্ত পিলার। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে সংঘে তার সেবাদায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজের জীবন যেমন খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন তেমনি মাতৃযত্নে অনেক সিস্টারকে গঠন দিয়েছেন একজন সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে গড়ে উঠতে। একজন আদর্শ নব্যা পরিচালিকা হয়ে তিনি নব্যাদের জীবন অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন, আলোর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। একইভাবে একজন সুদক্ষ নাবিকের মত সুদীর্ঘ ১২ বছর তিনি শক্ত হাতে সংঘের হাল ধরেছেন। যার উপর ভিত্তি করে সংঘ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছে। একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক, অভিভাবক, ভালোবাসার মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা, সুবিবেচনা, ও পরিণামদর্শিতার সাথে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। যিনি এক বটবৃক্ষ হয়ে সংঘের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতাকে হাতিয়ার করে একতা ও ভালোবাসার পথে এগিয়ে চলতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

এরপর তিনি ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর মাতৃগৃহে অবস্থান করে শান্তি ভবনের পরিচালিকা হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠা ও অসুস্থ ভগ্নিদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় তিনি খুবই আন্তরিক ও যত্নশীল হয়ে ভগ্নিদের সেবা করেছেন, ঐশসান্নিধ্য লাভের জন্য ভগ্নিদের প্রস্তুত করেছেন যার জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন শান্তি ভবনের 'মা'।

এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর তিনি মাতৃগৃহে থেকে সংঘের জন্য নীরবে বিভিন্নকাজ করে গেছেন যেমন- সিস্টারদের রেকর্ড সংরক্ষণ, ওলের কাজ, বিভিন্ন হাতের কাজ, সেলাই ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন অন্যান্য সেবা দায়িত্বের পাশাপাশি জাগরণী হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে তাদের সহযোগিতায় গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের নিয়ে দল গঠন করে পাট শিল্পের কাজ পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যদিয়ে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বেঁচে থাকার আশা খুঁজে পায়। অত্যন্ত হতদরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তির পথ পায় এবং সন্তানদের লেখাপড়া করানোর সুযোগ পায়। শ্রদ্ধেয়া সিস্টার যতদিন সচল ছিলেন ততদিন তিনি তার সাধ্যমত সংঘে সেবাদান করেছেন। বিশেষ করে তিনি তার প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, বার্ধক্যজনিত কারণে যে শারীরিক কষ্ট তা উৎসর্গ করেছেন সংঘের মঙ্গলের জন্য। অতপর তিনি প্রায় তিন মাস ধরে গুরুতর ভাবে অসুস্থ থাকার পর গত ২৭ আগস্ট, পিতার অন্তিম ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ। প্রার্থনার শক্তি নিয়ে তিনি তার বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সংঘের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সিস্টার ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। নিজেও নিয়মকানুন পালন করতেন এবং একজন পরিচালক হিসেবে সবাইকে কঠোরভাবে তা পালনে উৎসাহিত করতেন ও পরামর্শ দিতেন। তিনি সবসময় Community Spirit অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলতেন, সংঘবদ্ধ জীবনে পারস্পরিক ভালবাসা, ক্ষমা, মিলনের কথা বলতেন। তিনি একান্তভাবে চাইতেন যেন সংঘের মধ্যে ভগ্নিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়, আমরা যেন পরস্পরকে গ্রহণ করি, বুঝি, সমর্থন দেই। তিনি সংঘকে নিজের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন যেন আমরাও সংঘকে ভালবাসি এবং সংঘের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাই। অসুস্থতার সময়েও যতক্ষণ তিনি চেতনায় ছিলেন ততক্ষণ তিনি সংঘকে ভালবাসার, পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে গেছেন। তার এই অসুস্থতার সময়েও অনেকবারই তিনি সংঘের কর্ত্রীপক্ষ ও আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং সংঘের ক্যারিজম, ঐতিহ্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য যেন আমরা ভুলে না যাই সেই পরামর্শও দিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজা আমাদের জন্য ছিলেন এক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস। তার মনন-ধ্যান, চিন্তা-চেতনা এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে সুশৃংখল মনের অধিকারী। তাইতো ঈশ্বর তাকে নীরবতায় তুলে নিলেন তারই একজন করে। মৃত্যুর পূর্বদিন অনেকের আগমনে, সাক্ষাতে তিনি ছিলেন খুবই উৎফুল্ল এবং আনন্দিত। তার মুখাবয়বে ফুটে উঠেছিল এক উজ্জ্বল আলো যে আলোটি ধীরে ধীরে অনেকের উপস্থিতিতে নীরবে নিভে গেল। শ্রদ্ধেয়া সিস্টারকে হারিয়ে আমরা সবাই শোকাহত ও মর্মাহত। আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টার তেরেজার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি যেন স্বর্গ থেকে তিনি আমাদের উপর আশিস বারি বর্ষণ করতে পারেন। আমাদের শোকাভিভূত মন আজ বার বার বলছে–

"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ তুমি নাই
তুমি আছ মন বলে তাই!"

"এসএমআরএ ধর্ম সংঘ"

বিজ্ঞ/২৫০/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৩
১১ - ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৭ ভাদ্র - ২ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ক্রুশের শক্তি, ক্রুশে ভক্তি

ক্রুশ একটি চিহ্ন বা প্রতীক। পৃথিবীর বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র, চিকিৎসা উপকরণ ও চিকিৎসকদেরকে এ ক্রুশ চিহ্ন ব্যবহার করতে দেখি। তবে সে চিহ্নটি থাকে লাল রং-এর। রেডক্রসের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে তারা লাল ক্রুশ ব্যবহার করেন। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা রেডক্রসের মূল লক্ষ্য হলো যুদ্ধে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যন্ত্রণাকাতরদের সহায়তা করা। রেডক্রস কোন দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িত নয় বরং শুধু সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যই তারা নিয়োজিত। ধর্মের উর্ধ্বে ওঠেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ক্রুশ চিহ্নটি ব্যবহৃত হচ্ছে। লাল ক্রুশটি দেখলে যুদ্ধে জড়িতরাও সম্মান দেখায় ও শ্রদ্ধা করে। এই চিহ্নটি দেখলেই দুর্দশাগ্রস্তদের মাঝে আশা জাগে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্রুশ সকলের মাঝে শক্তি ও স্বস্তি আনে।

খ্রিস্টান ছাড়া অন্য ধর্মের ভাই-বোনদের কাছে ক্রুশ শুধুমাত্র একটি চিহ্ন ও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের চিহ্নিতকরণের একটি উপাদান। কিন্তু বিশ্বের সকল খ্রিস্টানদের কাছে তা একটি প্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক। ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে দিন শুরু এবং তা দিয়ে দিন শেষ করেন অনেক ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টবিশ্বাসী। ক্রুশকে আপন করে নিয়েই অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজের বাড়ি-ঘরের দৃশ্যমান স্থানে ক্রুশ প্রতিকৃতি রাখেন। তাই বর্তমান সময়ে ক্রুশ খ্রিস্টানদের কাছে গর্ব ও আত্মপরিচয়ের একটি মানদণ্ড। ক্রুশের প্রতি আস্থা, ভালবাসা ও সম্মান জানিয়েই প্রতিবছর ১৪ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। স্মরণ করা হয় মানবজাতির মুক্তি আনয়ন করতে ক্রুশেতে মৃত্যুবরণ করেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। ক্রুশের যাত্রাপথে যিশু বার-বার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, সৈন্য ও বিদ্রুপকারীদের তিরস্কার শুনেছেন। তবুও ক্রুশ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ভীষণ কষ্টকর হলেও তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। আর তাইতো যিশুর মধ্যদিয়ে ক্রুশ হয়েছে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়েই যিশু স্বর্গে যাবার পথ উন্মুক্ত করেন। আর তাইতো যিশু সকলকে উদাত্ত আহ্বান করেন, যেন সকলে প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করে তাঁকে অনুসরণ করে। ক্রুশ বহনের কষ্টের মধ্যদিয়েই সকলে বিজয়ের আনন্দ পেতে পারবে।

বর্তমানে খ্রিস্টানদের কাছে ক্রুশ গৌরব ও আনন্দের কারণ হলেও ক্রুশের মূল শিক্ষা হলো আত্মদান ও ভালোবাসা। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে মানুষকে ভালোবেসে যিশু নিজেকে ক্রুশে নিবেদন করেছেন। তাই ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার কারণে নিজেকে দান করবো। তবে নিজেকে দান করা এতো সহজ নয়। নিজের আরাম-আয়েস, সম্মান, ভোগ-বিলাসিতা, আমিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার, ঈর্ষা, রাগ ইত্যাদি ত্যাগ করতে প্রতিনিয়ত নিজের কাছে নিজেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীণ হই। এগুলোই আমার প্রতিদিনের ক্রুশ। যিশু আমাদেরকে আহ্বান করছেন এই ক্রুশগুলো বহন করতে। তাই ক্রুশ কষ্ট আনে; এটিই স্বাভাবিক ও সর্বজনীন একটি বোধ। কষ্টকর হলেও অপরের মঙ্গলের জন্য যখন আমরা নিজেদের ক্রুশগুলোকে বহন করি তখন যিশুর সাথে একাত্ম হই। যিশু আমাদেরকে প্রতিদিনকার নিজের ক্রুশ বহন করার আহ্বান জানিয়ে প্রতিদিন বিজয়ী হতে বলেন।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বৈশ্বিক একটি ক্রুশময় অবস্থা সৃষ্টি করছে। বৈশ্বিক এই ক্রুশকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং বহন করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তবে তা লাঘবের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন না থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। আমাদের নিজেদের মধ্যকার ব্যক্তিগত অপবোধগুলো যখন লোপ পাবে কখন ক্রুশের বোঝাও কিছুটা লাঘব হবে। পবিত্র ক্রুশের কাছে মৃত্যুর যেমন পরাজয় হয়েছিল, আমাদের সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াসে বৈশ্বিক দুরাবস্থার পরাজয়ও শিঘ্রই হবে। পবিত্র ক্রুশের শক্তি আমাদেরকে বিজয়ী হবার উৎসাহ ও শক্তি দান করুন॥ †

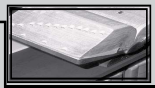

আমি আপনাদের বলছি : তেমনি ভাবেই, যাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়েও বেশী আনন্দ হয় যখন একজন পাপী মন ফেরায়। (লুক ১৫:৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

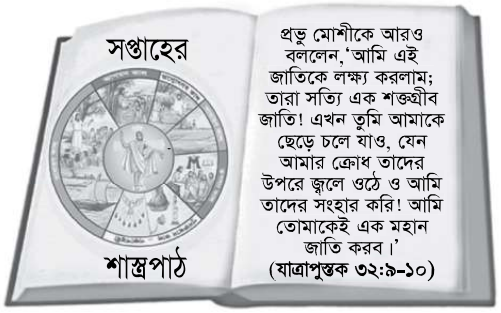

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ - ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১১ সেপ্টেম্বর, রবিবার

যাত্রা ৩২: ৭-১১, ১৩-১৪, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৫, ১৭, ১ তিমথি ১: ১২-১৭, লুক ১৫: ১-৩২ (সংক্ষিপ্ত ১৫: ১-১০)

১২ সেপ্টেম্বর, সোমবার

মারীয়ার পরম পবিত্র নাম

১ করি ১১: ১৭-২৬, ৩৩, সাম ৪০: ৬-৯, ১৬, লুক ৭: ১-১০

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

সাধু যোহন খ্রীসোস্তম, বিশপ ও আচার্য

১ করি ১২: ১২-১৪, ২৭-৩১, সাম ১০০: ১-৫, লুক ৭: ১১-১৭

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান* দেখুন

১৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব, *পর্ব*

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, নির্দিষ্ট পাঠসমূহ, পর্বের ধন্যবাদিকা স্তুতি

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

গণনা ২১: ৪খ-৯ (বিকল্প: ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১), সাম ৭৮: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন ৩: ১৩-১৭

১৫সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

শোকার্তা জননী মারীয়া স্মরণদিবস

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

হিব্রু ৫: ৭-৯, সাম ৩১: ১-৫, ১৪-১৫, ১৯, যোহন ১৯: ২৫-২৭ (বিকল্প লুক ২: ৩৩-৩৫)

১৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

সাধু কর্ণেলিউস, পোপ এবং সাধু সিপ্রিয়ান, বিশপ ও ধর্মশহীদ

১ করি ১৫: ১২-২০, সাম ১৭: ১, ৬-৮, ১৫, লুক ৮: ১-৩

অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান দ্রষ্টব্য

১৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার

সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও আচার্য / **বিঙ্গেনের সাধু হিল্ডেগার্ড,** কুমার ও আচার্য

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

১ করি ১৫: ৩৫-৩৭, ৪২-৪৯, সাম ৫৬: ৯-১৩, লুক ৮: ৪-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ সেপ্টেম্বর, রবিবার

+ ১৯৯১ ফাদার আন্তোনীয় বনোলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার এম যোয়ান অফ আর্ক স্পেইটস সিএসসি

১২ সেপ্টেম্বর, সোমবার

+ ১৯৬০ ফাদার গডফ্রে ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

+ ১৯৩৮ ফাদার ফ্রান্সিস বোয়ের্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ফাদার ফ্রান্সিস বার্টন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী ফিলেচিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

+ ২০০৬ সিস্টার মারীসেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

+ ১৯৪৩ সিস্টার এম ডোসিটে আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রাদার প্যাট্রিক লুইস ডি'কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

মূল্যবোধ-শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা - ২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পথচলার ৮২ বছর ২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্তমান বিশ্বে পরস্পর সংলাপ, শিক্ষা ও কর্মের ব্যবহারিক দিকগুলোই স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণে প্রভাবক" লেখায় সমাজের বর্তমান চিত্র সাহসিকতার সাথে জনসমক্ষে প্রকাশে সত্যিই প্রশংসার দাবিদার ভাই নোয়েল গনছালভেছকে আন্তরিক ভালবাসা এবং সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

লেখাটি অন্তর্নিহিত অর্থে ভরপুর। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমরা কতটা অভ্যস্থ ও সচেতন একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন। কথায় নয়, বাস্তবে অভ্যাসে পরিণত করতে ছোটবেলা হতেই সেই পদ্ধতি অবলম্বন ও শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। যেমন: পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে, সভা-সমিতির বিশেষ অনুষ্ঠানে কিংবা পথে-ঘাটে পরিচিত মানুষ, আত্মীয় স্বজনকে দেখামাত্র দু'হাত করজোড়ে সম্মান জানানো, ভাই কেমন আছেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসায় একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতার মনোভাব প্রকাশেই "পরস্পরের সাথে সংলাপ" এবং মত-বিনিময় করা সম্ভব। পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন দেশের কাথলিক মণ্ডলীর ৭/৮ টি সম্প্রদায়ের পুরোহিত, ব্রাদার এবং সিস্টারগণ বাংলাদেশে প্রাইমারী/স্কুল/কলেজ পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের শিক্ষাদানে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। "Charity begins at Home এবং শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" কথা মূল্যায়নে সু-শিক্ষায় অভ্যস্থ একজন শিক্ষার্থী সু-নাগরিক হিসেবে কর্মজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেই "সমাজে/বিশ্বে শান্তি বিনির্মাণে" পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সক্ষম।

ক্রেডিট ইউনিয়নের বদৌলতে বিগত ৫০ বছরে খ্রিস্টভক্তদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উর্দ্ধমুখী হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে বর্তমানে মান-নির্ণয়ে নিম্নমুখী। ফলে শস্যক্ষেত্রে আগাছা জন্মেছে, নিড়ানীর প্রয়োজন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু যোগ্যতা সম্পন্ন পরিচালকের। এমন কি সুশীল সমাজের অনেকেই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু পরিবেশ বিবেচনায় না দেখার ভান করে চুপ থাকা শ্রেয় মনে করায় মধ্যবিত্ত পরিবার হতাশায় ভুগছে। এখানেই সমস্যা। তাই বলে নিরাশ হলে চলবে না। বর্তমানে মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগীকেও ব্যয়-বহুল চিকিৎসায় রোগমুক্তি করা সম্ভব। ঠিক তেমনি আদরের সন্তানদের মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষা যেমন: পিতা-মাতাকে মান্য করিবে, গুরুজনকে সম্মান করিবে, সদা-সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কথা বলিবে না শিক্ষাদানে অদূর ভবিষ্যতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অক্ষুন্ন থাকিবে, বিশ্বাস করি।

"কর্ম-ই-ধর্ম দুটিই মানুষকে বিশালত্ব দান করে" লেখাটির সাথে একমত পোষণে শ্রদ্ধেয় গুণীজনের লেখা (সংগৃহীত) সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরিলাম। ধন্যবাদ।

মানুষের কর্ম-ই-ধর্ম

সংগৃহীত

ধর্ম সব মানুষের জন্য, মানুষ কেবলি ধর্মের জন্য নয়,
সব ধর্ম মতাভেদের উর্ধ্বে হোক মানবতার জয়।
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর মুসলমান
যে যাই হউক না কেন সবাই আদম সন্তান।
আল্লাহ বলো, যিশু বলো, ভগবান বলো;
যেভাবেই ডাকো না কেন ভাই,
সৃষ্টিকর্তা আসলে একজনই
যাকে ছাড়া কারও নিস্তার নাই।
ধর্ম নিয়ে হানাহানি মোদের কেবলি অজ্ঞাতবশে,
মানুষের কর্মকাণ্ডে হাসেন বিধাতা উর্ধ্বে বসে।
একথা কখনো মোদের ভুললে চলবে না কভু,
মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন মোদের একই প্রভু।
ধর্মের বহুপূর্বে এসেছিল মানুষ
মানবতা বিনে কেন মোরা আজ ধর্মের ফানুস।
বলেনি এমন কোন ধর্ম, করতে মানুষ নির্মূল,
মানবতার কল্যাণে এলো ধর্ম, শোধরাতে মানুষের ভুল।
মাটির মানুষ মোরা সৃষ্টির রহস্য বোঝা ভার,
তবুও বলি মানবতা ব্যতিরেকে ধর্ম অন্তঃশূন্য সার
হে সাধক কেন মিছে ভুলে যাও পাছে,
বিধাতার সন্তুষ্টি মেলে মানব সেবার মাঝে।
মোরা যে-ই হই না কেন, যেথায় হোক জন্ম
মানব কলাণে মানবতাই হোক মানুষের ধর্ম।

- পিটার পল গমেজ

ক্রুশ: শুরু ও সমাপ্তি

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

ক্রুশ কথাটি মনে পড়ার সাথে সাথেই আজ আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে, ক্রুশ আজ আমাদের কাছে গর্বের ও অহংকারের। অনেক দেশের জাতীয় পতাকা ক্রুশ চিহ্নে সুশোভিত হয়ে আছে। লাল ক্রুশ খ্রিস্টানগণ গর্বের সাথে পরিধান করে কেননা তা হল সেবা আর উৎসর্গের এক মহান আদর্শ ও পরিচয়। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শ্রদ্ধা জানায় এই লাল ক্রুশকে। খ্রিস্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর সাথে যুক্ত হয়ে ক্রুশ শব্দটি একটি নতুন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও পূর্ণতা দান করেছে। তাই পবিত্র ক্রুশ হয়ে উঠেছে মানবজাতির জন্য ভালবাসার প্রতীক, পরিত্রাণের আশা, নব-জীবনের প্রত্যাশা, ক্ষমার চিহ্ন এবং পাপশক্তিকে জয় করার একমাত্র অবলম্বন।

ক্রুশের মধ্যদিয়ে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার, অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে খ্রিস্টের পরম ভালবাসা ও ক্ষমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ক্রুশ কত মহান, কত পবিত্র। এই ক্রুশই খ্রিস্টের বিজয়মুকুট, রাজ সিংহাসন। এই কারণেই ক্রুশের মহিমা এত অপার। ক্রুশ আমাদের পরিচয়। ক্রুশচিহ্ন দিয়েই আমাদের জীবনের শুরু, ক্রুশের আদর্শেই জীবনের পরিণতি এবং ক্রুশের চিহ্ন দিয়েই আমাদের সমাধি। ক্রুশ থেকেই প্রভাহিত শাশ্বত জীবন-ধারা, কুক্ষিদেশ থেকে রক্ত ও জল নিঃসৃত হয়ে জগতকে করেছে পরিশুধিত ও বিশুদ্ধ । এই ক্রুশ না থাকলে আমরা পেতাম না পরিত্রাণ, পারতাম না অন্যকে ভালবাসতে, স্থাপন করতে পারতাম না ক্ষমার আদর্শ, আর স্বর্গদ্বারও উন্মোচিত হতো না আমাদের জন্য।

যিশু বলেন- "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মার্ক ৮:৩৪)*। পুরাকালে ইহুদী ঐতিহ্যে ক্রুশ ছিল ঘৃণার প্রতীক–সর্বজন নিন্দিত। অতি জঘণ্য অপরাধীকে নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা ছিল রোমীয় শাসনামলের শাস্তির বিধান। তৎকালীন সমাজে যারা ক্রীতদাস, রাজনৈতিক বিদ্রোহী কিন্তু রোমান নাগরিক নয়, তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার প্রচলন ছিল। তাই ক্রুশের প্রকাশ ছিল ভীতিকর, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিভীষিকাময় ও মৃত্যুশীতল।

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট স্বীয় জীবনের বিনিময়ে মানবমুক্তিকল্পে সেই অভিশপ্ত ক্রুশে পড়িয়েছেন মহিমার আভরণ, যা আমাদের গর্বের একমাত্র কারণ–মুক্তির সনদ। খ্রিস্টের এই মহৎ আত্মসমর্পণ আমাদেরকে সর্বদা উর্ধ্বে তুলে ধরে। ফলশ্রুতিতে পরম পিতার সাথে আমাদের এক আত্মিক মিলন-বন্ধন স্থাপিত হয়। পবিত্র ক্রুশ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের চিহ্ন। এটি হচ্ছে খ্রিস্টধর্মের সর্বজনীন প্রতীক যা খ্রিস্টকে প্রচার করতে সাহায্য করে। কালভেরীতে

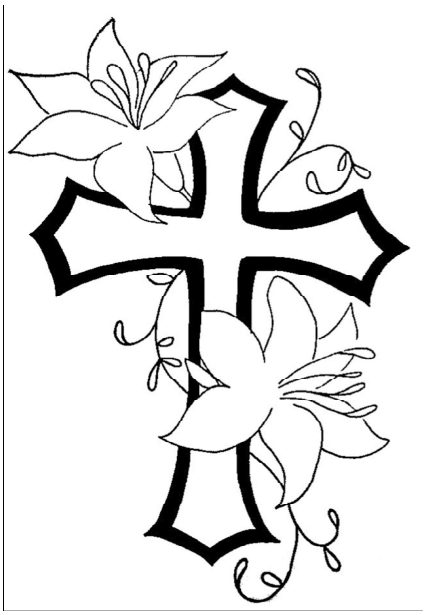

খ্রিস্টের আত্মত্যাগের জন্যই এই ক্রুশীয় মৃত্যু পাপী মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার ও সহানুভূতির চিহ্ন হয়ে ওঠে। তবে ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের পরই কেবল মাত্র মণ্ডলী প্রকাশ্যে ক্রুশ ব্যবহার শুরু করে।

যিশুর জীবন, আশ্চর্য কাজ, উপদেশ শুনে যিশুর উপর বহু লোকেরা বিশ্বাস ও আশা জেগেছিল। লোকেরা ধরেই নিয়েছিল যিশুই বুঝি তাঁদের প্রকৃত মশীহ বা ত্রাণকর্তা। কিন্তু ঈশ্বর পুত্র যিশুকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশে ঝুলতে হলো। যিশুর এই লজ্জাজনক মৃত্যুতে অনেকে আঘাত পেয়েছে, যিশুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছে, ভয় পেয়েছে। কিন্তু এই ক্রুশই শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। সেই ক্রুশকেই আমরা ঝুলিয়ে রাখি আমাদের গলায়, ঘরের ভিতর আলতারে, সিংহাসন তৈরী করে মহিমার আসন দিই। ক্রুশের লজ্জাকে যিশু পরিণত করেছেন গৌরবে, শোক পরিণত হল আনন্দে। আর আমাদের জন্য ক্রুশ হল ঠিকানা ও আশ্রয়।

খ্রিস্ট আমাদের পাপের বোঝা কাঁধে নিয়েছেন। মানুষের পাপগুলো জঘণ্য ঘৃণার বস্তু ছিল যিশুর জীবনে। আশ্চর্যের বিষয় সমস্ত মানব জাতির ক্রুশ তিনি একা বহন করেও ক্লান্ত হননি, পিছিয়ে পড়েননি কিংবা পালিয়ে যাননি। কিন্তু আমরা নিজেদের ক্রুশ বহন করতে করতে অনেকবার ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কতবার পালিয়ে যাই, পিছিয়ে পড়ি, অন্যকে দোষারোপ করি। প্রভু যিশু কাউকে দোষারোপ করেন নি। বরং নিজ শিরে কাঁটার মুকুট ধারণ করে আমাদের পড়িয়েছেন মহিমার মুকুট। আপন রক্ত দিয়ে ধৌত করেছেন আমাদের পাপের সমস্ত কলঙ্ক। তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন আমরা যেন পুরোপুরিভাবেই জীবন পাই।

জীবন ও ক্রুশ আমাদের জীবনে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। জীবন আছে বলেই ক্রুশ আছে আবার এই ক্রুশকে আমরা বাদ দিতে পারি না। কেননা যারা শিশু তারা পড়াশোনাকে তাদের জীবনে কঠিন ক্রুশ মনে করে। যারা শৈশব কৈশোরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে তারা পিতামাতা, গুরুজন, শিক্ষকমণ্ডলীর শাসনকে ক্রুশ বলে মনে করতে পারে। যারা যুবক যুবতী, পড়াশোনা করছে, এখনও লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি তারা চায় জীবনে স্বাধীনতা। এমনকি জীবনে চলার পথে মানুষটি সন্ধান করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারাটা তো তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ক্রুশ। আবার যারা সংসার করছে অথচ চাকুরী নেই কিন্তু চাহিদার কোন সীমা পরিসীমা নেই তাদের কাছে হতাশাটাই তো জঘণ্য ক্রুশ বলে মনে হয়। পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়িও অনেকক্ষেত্রে বড় ক্রুশ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রুশ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নেই।

কিন্তু এই ক্রুশই মুক্তির সোপান। ক্রুশ সবকিছুর মূলাধার। ক্রুশেই সকল স্বার্থকতা নিহিত এই কথাটাই আমরা হয়তো বারবার ভুলে যাই। ক্রুশের পরশে সমস্ত বেদনা ফুল হয়ে ফুঁটে ওঠে। ক্রুশেই আমরা জীবন পাই, ক্রুশেই আমরা শক্তিমান হই। ক্রুশই আমাদের পরিত্রাণ, ক্রুশই আমাদের জয়নিশান। ক্রুশই আমাদের একমাত্র পরিচয়, ক্রুশের চিহ্নেই আমরা চিহ্নিত। ক্রুশের আশ্রয়ে আমরা অমৃতময়– তাই ক্রুশ আমাদের শ্লাঘার বিস্ময়।

ক্রুশ ছাড়া খ্রিস্টান মানুষের কোন পরিচয় নেই। জন্মের পর দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের প্রত্যেকের কপোলে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করে দেয়া হয়েছে। আমাদের গোটা জীবনটা ক্রুশ দ্বারা আবর্তিত। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারে ক্রুশ রয়েছে, ঘরের ছাদে কিংবা টিনের চালে ক্রুশ রয়েছে। আমাদের গির্জায়, কবরস্থানে ক্রুশ রয়েছে। গাড়িতে, মোটর সাইকেলে, খ্রিস্টভক্তদের গলায় ক্রুশ ঝুলতে দেখা যায়। সাক্রামেন্তীয় কাজ, খ্রিস্টযাগের শুরুতে ও শেষে ক্রুশের চিহ্ন করা হয়। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে সবার আগে ক্রুশের চিহ্ন করার মধ্যদিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

আমাদের পিতামাতা ও ফাদার ব্রাদার সিস্টারগণ আমাদের শিখিয়েছেন ঘুম থেকে উঠে ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে যেন ক্রুশের চিহ্ন করি। তাছাড়া আমরা যখন কোন বিপদের মুখে পড়ি কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে ভয় পাই তখন ক্রুশ আমাদের রক্ষা করে, সাহস যোগায়। ক্রুশের চিহ্ন কি সত্যি আমাদের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? যখন আমরা ক্রুশের দিকে তাকাই তখন দেখি কাঠ বা ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী ক্রুশ। কিন্তু এই ক্রুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভু যিশুখ্রিস্ট এই ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছেন। আমরা আমাদের হৃদয় ও মনে শক্তি পাই। কেননা জঘণ্য, ঘৃণিত অপমানকর ক্রুশকে প্রভু যিশু করে তুলেছেন মহিমার, গৌরবের ও পরিত্রাণের। ক্রুশের চিহ্ন করার সময় আমরা যে শব্দগুলো উচ্চারণ করি তখন খ্রিস্ট যে আমাদের রক্ষা করার জন্য ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন সেই সত্য স্বীকার করি।

এই পৃথিবীর সবাই ঘৃণাভরে ক্রুশকে দূরে ঠেলে দিলেও এই ক্রুশে যিনি নিহিত তিনি সবাইকে তাঁর বুকে টেনে নেন। তাই ক্রুশই আমাদের ত্রাণের আশ্বাস, অবিনশ্বর জীবন পথের সম্বল, অনিষ্টের কবল হতে মুক্তির নিশ্চয়তা। এই ক্রুশে সঞ্চারিত হয় ঐশ মাধুর্য, প্রকাশ পায় জীবন ধারণের প্রেরণা। ক্রুশই আত্মিক শক্তির উৎস, পবিত্রতার পরাকাষ্ঠ। খ্রিস্ট ক্রুশ বহন করে আমাদের মুক্তির রাজপথ দেখিয়েছেন, যেন আমরাও জীবন পথে তাঁর সহযাত্রী হতে পারি। খ্রিস্ট যিনি আমাদের পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলছেন আমরাও যেন তার অনুসরণ করতে পারি।

অতি ঘৃণিত বস্তু ক্রুশে প্রেমের শয্যা পেতে মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি হয়েছেন মানুষ যেন জীবনময় আলোর সন্ধান পেতে পারে। যিশু বলেন- আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই পায়। নব সূর্যোদয় যেমন মর্ত্যলোকের সমস্ত অন্ধকার দূরিভূত করে তৃষিত প্রাণে জাগায় নতুন আশা, সমরূপে খ্রিস্টের যন্ত্রণা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সকল মন্দতা নিশ্চিহ্ন করে আমাদের দেখায় অনন্ত জীবনের সূর্যোদয়। মহান সাধু লিও বলেন, "যদি কেউ খ্রিস্টের সঙ্গে যাতনাভোগ, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান না করে তবে সে খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হতে পারে না, কারণ খ্রিস্ট নিজেইতো যাতনাভোগ, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন"। ক্রুশের রহস্য এই, আপাতত: দৃষ্টিতে ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যুতে যিশুর সব কিছুর শেষ মনে হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ক্রুশই যিশুর অমৃত জীবনের শুরু। ক্রুশ মৃত্যুকে মনে হয়েছিল শয়তানের শক্তির চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিজয়। কিন্তু এই ক্রুশই মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের শক্তির মহান বিজয়। কবি যথার্থই বলেছেন, "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" যিশু ক্রুশে জীবন দানের মধ্যদিয়ে আমাদের নব জীবন দান করেন।

ক্রুশের মধ্যদিয়ে যেভাবে বিজয় এসেছে ঠিক একইভাবে আমাদের ভিতরকার অহংকার, স্বার্থপরতা, লোভ, অন্যকে গ্রহণ না করার মনোভাব, ঠকানোর স্বভাব, প্রতিশোধের দাবানল, অবিশ্বস্ত জীবনযাপন, দলাদলি, ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন, সেচ্ছাচারিতা দূর করতে হবে। এ ধরণের আরো অনেক রিপু আমাদের জীবনের সৌন্দর্যকে কলুষিত করে। যে ক্রুশ আমরা বেছে নিয়েছি সেই ক্রুশকে কলঙ্কিত করে। এগুলো আমাদের ভেতর থেকে দূর করতে হবে। জানি এ কাজ করা সহজ নয়। তবু ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল। ক্রুশের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমরা এই অশুভ, অপশক্তি আমাদের জীবন থেকে বাদ দিতে পারব। ক্রুশ আমাদের রক্ষকবচ, ক্রুশ আমাদের পরিত্রাণ ও শ্বাশত জীবনের প্রতিশ্রুতি। এই বিশ্বাস ও আশায় আমাদের জীবন ক্রুশের বিজয় আনন্দে ভরিয়ে তুলুক॥

বিজ্ঞ/২৫৫/২২

পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব

কমল পালমা

যিশুর সময়ে রোমান সাম্রাজ্যে ক্রুশ ছিল মন্দতার প্রতীক, অপরাধির মৃত্যুদণ্ডের একটি যন্ত্র। রোমীয়দের শাসন আমলে কর্তৃত্বের ভয় এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য অপরাধীদেরকে জনসম্মুখে ক্রুশে ঝুলানো হতো। ক্রুশে যিশুর বলিদানের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ঘৃণিত ক্রুশ হয়ে উঠেছে পবিত্র ক্রুশ। তাই পবিত্র ক্রুশ হলো ভালোবাসার প্রতীক। যখন আমরা একজনকে ভালবাসি তখন আমরা যেকোন কষ্ট সহ্য করে থাকি। ঈশ্বর আমাদেরকে এতটাই ভালোবেসেছেন যে তিনি তার নিজ পুত্রকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। যিশু আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে পিতা ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয় নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে ক্রুশে বলি দিয়ে।

মাতামণ্ডলীতে ১৪ সেপ্টেম্বর পালিত হয় পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব। এই দিনে আমরা যখন পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব পালন করতে একত্রিত হই তখন একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা কী উদ্‌যাপন করতে চাই? আমরা কি দুঃখ কষ্টকে ভালোবাসি যার জন্য মৃত্যুর একটি উপকরণ রূপে উদ্‌যাপন করি নাকি আমরা খ্রিস্টকে ব্যক্তি জীবনে ধারণ করে ক্রুশের লজ্জাজনক মৃত্যু-যন্ত্রণা জয় করে পুনরুত্থিত খ্রিস্টকেই আস্বাদন করি। আধুনিক বিশ্ব, নিশ্চয়ই আপাতদৃষ্টিতে পরাজয় উদ্‌যাপন করে না। আমরা বর্তমানে যা উদ্‌যাপন করতে চাই তা হল বিজয়ের মুহূর্ত। আমরা আবার এমন লোকদের গল্প দ্বারাও অনুপ্রানিত হই যারা বড় প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হয়। ক্রুশ বহন করে জয়ী হওয়াই হলো জীবনে সবচেয়ে বড় জয়।

ক্রুশ হলো আনুগত্যের বিজয়

পবিত্র ক্রুশ হলো ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের বিজয়। আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই, কিভাবে যিশু পিতা ঈশ্বরকে অনুরোধ করছিলেন যে পিতা যদি সম্ভব হয় তাহলে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূর করো কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা কতবার ভয়ে কাঁপতে থাকি যখন আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের পরবর্তী জীবনে ডাকছেন? অযোগ্যতা, লজ্জা এমনকি অপরাধবোধের চিন্তা আমাদের মনকে জর্জরিত করে। আমরা নিজেদেরকে বলি যে ঈশ্বর আমাদের কাছে যা চাও তা আমরা সম্ভবত করতে পারি না। আমরা তার জন্য দর কষাকষি করি যাতে আমরা অন্য পথ বেছে নিতে পারি। আমরা তাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করি যে আমাদের এমন রাস্তায় না নিয়ে যান যেখানে আমরা হাঁটার সাহস করতে পারি না।

গেৎসিমানিতে যিশু ঠিক এটাই করেছিলেন। কিন্তু তার প্রার্থনার শেষে, যিশু পিতার ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন -"আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক"। তিনি ক্রুশকে আলিঙ্গন করেন এবং ঈশ্বরের সাথে পরিত্রাণ কাজ সহযোগী হন। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু করতে চাই না। কারণ আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে পারিনা এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা কম তাই প্রকাশ করি।

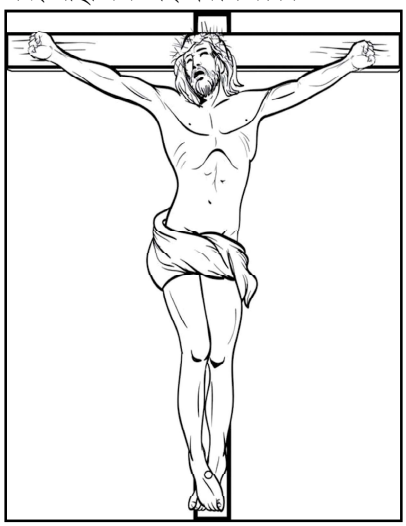

ক্ষমা ও মুক্তির প্রতীক হলো ক্রুশ

পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ক্রুশ শুধুমাত্র আনুগত্যের জয়ের কথা বলে না; ক্ষমা ও মুক্তির কথাও বলে। আমরা মনে করি যে, ক্রুশেই যিশু তাদের সকলকে ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা তাকে অত্যাচার করেছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল। ক্ষমার শক্তি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যখন জীবনের শেষ মুহূর্তে তার পাশে ঝুলে থাকা একজন চোর তার সাথে যাওয়ার কথা বলেন। সেখানে, তাদের ঘিরে থাকা সমস্ত ঘৃণার মাঝে, যিশু চোরকে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন। মৃত্যুর মাঝে, যিশু তাকে ক্ষমা করেন এবং তার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দেন। আমাদের জীবনের যখন দুঃখ-কষ্ট আসে আমরা ঈশ্বরকে দোষারপ করি, অন্যকে দোষ দেই, নিজের কপালকে দোষারোপ করি এমনকি আমরা আমাদের জন্মকেও অভিশাপ দেই। আমরা একটিবারও ভাবিনা যে এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের গৌরব নিহিত রয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্যে ক্রুশ কারো কারো জীবনে এমন প্রতীক হয়ে উঠেছিল যারা জীবনের সুযোগ হারিয়েছে, যিশু তাদের জন্য এই ক্রুশকে রূপান্তরিত করে দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত সুযোগ রূপে এবং চোরদের একজনের জন্য মুক্তির প্রতীক করে তোলেন। ক্রুশের বিজয় নিন্দার উপর মুক্তির বিজয় উদ্‌যাপন।

ক্রুশের বিজয়ই প্রেমের বিজয়

ক্রুশের বিজয় হলো মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের বিজয়। যিশু তাঁর সমস্ত জীবন জুড়ে শত্রুকে ভালবাসতে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করার বাণী প্রচার করেছেন। শেষ নৈশভোজে, তিনি তাঁর শিষ্যদের একে অপরকে ভালবাসতে উৎসাহিত করেছিলেন যেমন তিনি তাদের ভালবাসেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা শত্রুকে ভালোবাসা তো দূরে থাক, তার ছায়াও মাড়াতে চাই না। শত্রুকে অভিশাপ দেই এবং ক্রোধের অগুনে আমরা নিজেরা কষ্ট পাই। যদিও আমরা সকলেই জানি যে, দৈনন্দিন জীবনের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায়, ভালবাসার আদর্শ দেখানোর চেয়ে বলাটা খুবই সহজ। তবুও যখন যিশুকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন তিনি ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দেন। ক্রুশে জীবন দিয়ে যিশু দেখান যে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা শুধু কথায় নয় কাজেও। ক্রুশে, তিনি দেখান যে ভালোবাসা নিছক তৃপ্তি বা উপভোগের অনুভূতি নয়, ক্রুশে যিশু প্রমাণ করেন যে প্রেমকে স্বাধীনভাবে বেছে নিতে হবে। একবার এটি বেছে নেওয়া হলে, এটি অন্যদের জন্য পরিত্রাণে ফলদায়ক হবে। ক্রুশে যিশু ঘৃণা-নিন্দা এবং আত্মতৃপ্তির কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেন। ক্রুশে, তিনি ঘোষণা করেন যে প্রেম, ক্ষমা এবং আনুগত্য জীবনে একটি বিজয় আনতে পারে এবং এটি একটি মহা বিজয় যা উদ্‌যাপন করা প্রয়োজন।

আমি মনে করি আমাদের বাস্তব জীবনে ক্রুশ হলো আমাদের সীমাহীন ইচ্ছা এবং আকাংঙ্খা। আমাদের ইচ্ছা-আকাংঙ্খার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা আমাদের জীবনে ছোট ছোট কষ্ট সহ্য করতে চাই না। আমাদের ইচ্ছার বাইরে যদি কোন কিছু হয় আমরা অনেক সময় ক্রুশে বৃদ্ধ হওয়ার মত কষ্ট অনুভব করি। কিন্তু যিশু তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কছে সমর্পণ করেছেন। যিশু কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিতা ঈশ্বরকে বলেছিলেন যে যদি সম্ভব হয় এই দুঃখের পেয়ালা সরিয়ে নাও, পিতা তবে আমার ইচ্ছা নয় তোমরা ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আসুন আমরা ক্রুশের বিজয়োৎসবে আমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে তুলে দেই॥

ক্রুশ

আলবেন ইন্দোয়ার

ক্রুশকে আমি ভালোবাসি, ক্রুশকে করি ভক্তি।
ক্রুশই আমার জীবন মরণ, ক্রুশই আমার
মুক্তি।। (গীতাবলী-৯৮৫)

ক্রুশকে বলা হয় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পরিচয় পত্র। যার মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে। আর অন্যদের কাছে খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে জীবন সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে ক্রুশের সম্মান বা গুরুত্ব বা মূল্য অনেক বেশি দিয়ে থাকে। কেননা একে কেন্দ্র করেই একজন খ্রিস্টভক্তের জীবনযাপন নির্ভর করে। আবার এর মধ্যদিয়েই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে যেতে হয়। ক্রুশ হলো আমাদের মুক্তির পথ। ক্রুশ হলো আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যাকে সম্বল করে খ্রিস্টান হিসেবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রভু যিশুখ্রিস্ট যদি ক্রুশ বহন না করতেন তাহলে পরিত্রাণ বা মুক্তি আসত কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে ঘৃণার বা তুচ্ছ বিষয়টিকে সবচেয়ে পবিত্র করে তুললেন। প্রাচীনকালে ক্রুশকে সবচেয়ে ঘৃণা বা তুচ্ছ তাচ্ছিলের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর যাদেরকে বা যাকে ক্রুশে ঝুলানো হতো বা ক্রুশে দিত তাকে বা তাদেরকেও সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র বলে গণ্য করা হতো। কারণ তৎকালীন সময়ে এটাই সবচেয়ে লজ্জাজনক শাস্তি বলে বিবেচ্য ছিল। তাই আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট এই ঘৃণিত বা তুচ্ছ বিষয়টি সবার সম্মানের এবং প্রিয় করে তুললেন। একজন খ্রিস্টান হিসেবে প্রতিনিয়তই ক্রুশকে অনুসরণ, অনুকরণ করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার। যাতে করে নিজে পরিত্রাণ পেতে পারি আর অন্যকেও পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি।

পবিত্র ক্রুশ দু'টি কাঠ দিয়ে গঠিত হয়। একটি হলো লম্বালম্বি আর অন্যটি হলো পাশাপাশি। এর অর্থ অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, লম্বালম্বি অংশটি নির্দেশ করে ঈশ্বরের সাথে আমাদের মিলনের চিহ্ন। যা প্রভু যিশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সরাসরি সংযোগের মাধ্যম হয়েছেন এবং পিতার কাছে যাবার পথ দেখিয়েছেন এবং সুগম করে গেছেন। যাতে করে আমরা হারানো মেষের মত হারিয়ে না যাই। আর পাশাপাশি অংশটি প্রকাশ করে যে, আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের একটি প্রকাশ। অর্থাৎ আমার সাথে আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশি আর যাদের সাথে চলা ফেরা করি তাদের মধ্যে আমার সম্পর্ক কেমন। তাদের সাথে যদি আমার ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ক্রুশ তৈরি করতে সক্ষম হতে পারি। তখন দু'ফালি কাঠ শুধু কাঠ থাকে না বরং সেটা হয়ে উঠে একটি পরিপূর্ণ ক্রুশ। আর যদি তাদের সাথে আমার বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকে তাহলে সেটা শুধু দু'ফালি কাঠই থেকে যায়।

প্রভু যিশুর ক্রুশ বহনে অনেক প্রলোভন আসলেও পিছু পা হননি। যদিও তিনি মনের কষ্টে জর্জরিত হয়ে বলেছিলেন, "পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে দূরেই সরে যাক! তবে আমার যা ইচ্ছা তা নয় – তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক *(মথি ২৬:৩৯)*।" প্রভুযিশু ক্রুশ বহনে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেননি বরং পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন এবং ক্রুশে লজ্জাজনক মৃত্যুবরণ করেছেন। এরই মধ্যদিয়ে পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে এবং ক্রুশের উপর বিজয় লাভ করেছেন। যেটি সবচেয়ে ঘৃণার বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ছিল সেটি হয়েছে সবচেয়ে পবিত্র, সম্মানের এবং উচ্চ প্রশংসার। এভাবেই প্রভু যিশু আমাদের তাঁর জীবন দ্বারা অনুপ্রেরণা দেন। যেন আমরা কোনো ভাবেই পিছিয়ে না পড়ি আর আমাদের দৈনন্দিন ক্রুশ বহনে পিছুপা না হই।

প্রভু যিশু ক্রুশ বহন করেছিলেন তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ (রোগীকে সুস্থ করা, অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়া, পাপীকে ক্ষমা দান ইত্যাদি) আর সত্য কথা বলা, নিজেকে ঈশ্বরের একান্ত প্রিয়জন বলে দাবি করার জন্য। বলা যেতে পারে যে, এটাই যিশুর জীবনের ক্রুশ ছিল। তাই সমাজগৃহের নেতারা ও ফরিসীরা তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জীবনের ক্রুশগুলো কি হতে পারে? হতে পারে আমার ভালো লাগা বিষয়গুলো যেগুলো থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই কিন্তু পারি না, যে বিষয়গুলো প্রতিনিয়তই আমাকে জ্বালায় বা কষ্ট দেয়, আমার নিম্নতর স্বভাবগুলো। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো সব সময় আমাকে ভালো হতে বাধাগ্রস্ত করে আর উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এগুলোকে বহন করতে অনেক সময় আমরা পাশ কাটিয়ে বা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। তখনই আমরা যিশুর মতো না বলে বলি, পিতা তোমার ইচ্ছা নয়, আমার ইচ্ছাই পূরণ হোক। সব সময় আমরা আমাদের ইচ্ছাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে পছন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ক্রুশ বহন করতেই হবে। অন্যথায় আমরা বিজয় লাভ করতে পারব না। ফলশ্রুতিতে আমাদের অবস্থান নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থায় চলে যেতে পারে। তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন আমাদের ছোট ছোট ক্রুশগুলোকে নিয়ে যিশুর পেছনে পেছনে কালভেরীর পথে যাত্রা করা। আর নিজের ইচ্ছাকে নয় বরং যিশুর ন্যায় পিতার ইচ্ছাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া। একজন খ্রিস্টান হিসেবে এটাই হওয়ার কথা। তাই আমরা যদি পরিত্রাণ লাভ করতে চাই তাহলে ক্রুশকে আমাদের প্রধান হাতিয়ার করতে হবে। যাতে করে কোনো মন্দ শক্তি আমাদেরকে মন্দতার দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

ক্রুশ বহন আমাদের জীবনে অবধারিত। এখন আমাদের উপর নির্ভর কারে আমি তা বহন করবো কিনা। যদি আমি পরিত্রাণ পেতে চাই তাহলে আমাকে স্ব-ইচ্ছায় আমার প্রতিদিনকার ক্রুশ বহন করতে হবে আর কালভেরীর পথে যিশুকে অনুসরণ করতে হবে। আর যদি না চায় তাহলে আমার পরিত্রাণও হবে না বরং পাপের দাসত্ব থেকে থেকে একদিন আমরা পাপেই নিঃশেষ হয়ে যাব। আমরা কোনো সময় চাই না আমরা পাপের দাসত্বে থেকে পরাধীন জীবনযাপন করতে। আমরা চাই স্বাধীন জীবনযাপন করতে। তাই যিশুর কাছে শক্তি চাই তিনি যেন আমাদেন পথ দেখান যেন আমরা আমাদের ক্রুশ বহন করে কালভেরীতে যাত্রা করতে পারি॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
১. পবিত্র বাইবেল
২. গীতাবলি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউয়ন লি: ঢাকা

পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন
নিরাপত্তা কর্মী	৪০ জন	আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের যোগ্যতা: কমপক্ষে এসএসসি পাস, বয়স ২০ হইতে ৪৫ বৎসর, উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। অফিস কর্তৃক থাকার ব্যাবস্থা করা হবে বৎসরে উৎসব অনুযায়ী ২টি বোনাস প্রদান করা হবে। সমস্ত কর্মীদের জন্য বীমার ব্যাবস্থা আছে। এ ছাড়াও বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থ কালীন ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ও ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন। সকল ধর্মের আগ্রহী প্রর্থীগণ নিম্ন ঠিকানায় আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত: জীবন বৃত্তান্ত, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরকিত্ব সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, রক্তের গ্রুপের সনদপত্র, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে চার্চের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে, খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস
মাদার তেরেসা ভবন, তেজগাঁও ক্যাথলিক চার্চ
২ নং তেজকুনী পাড়া তেজগাঁও ঢাক-১২১৫।

বিজ্ঞ/২৫৮/২২

শোকের সুখে

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

কষ্টের পরে যখন সুখ আসে, তখন মানুষ সেই কষ্টকে ভুলে যায়; বরঞ্চ কষ্টের পরের সুখের অনুভূতি বা ব্যঞ্জনা আরো বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে। যখন কোন সন্তানের জন্ম হয়, সেই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু সন্তান জন্মলাভ করার পরে যখন মা সে সন্তানের হাসিমাখা মুখ দেখে, তখন তার হৃদয় এক বর্ণনাতীত ভালো লাগায় ভরে ওঠে। মা সব কষ্ট ভুলে যায়।

মা মারীয়া আজীবন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ জন্য শত দুঃখ-কষ্ট তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। তবে তাঁর জীবনে ৭টি বিশেষ ঘটনা বা শোক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এ শোকাবহ ঘটনাগুলো মেনে নেওয়া যে কোন মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

১. সিমেয়োনের ভবিষ্যদ্বাণী: ইহুদী প্রথা অনুসারে, মা মারীয়া যিশুকে জেরুসালেম মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে যান। আমাদের বর্তমান সময়ে অনেকটা দীক্ষাস্নানের মত। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে অনেক আনন্দ ছিল। সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে অনেক বিশ্বাস ও আশা নিয়ে তিনি জেরুসালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিমেয়োনের মুখে তিনি একি শুনলেন? তার সমস্ত আনন্দ ও প্রত্যাশা পরিণত হল আশঙ্কায় ও গভীর উৎকণ্ঠায়; কেননা এমনকি তার হৃদয়ও নাকি খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে!

কোন বাবা-মায়ের কাছে যদি কেউ সদ্যোজাত সন্তানের বিষয়ে বলে যে, আপনাদের এই সন্তান একদিন অনেকের পতনের কারণ হবে আবার অনেকের উত্থানের কারণ হবে। তখন সেই পিতা-মাতার কেমন লাগবে? আপন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেই পিতা-মাতার মনে গভীর আশঙ্কা জাগবে না? তাহলে মা মারীয়ার কেমন লেগেছিল? এক অজানা আশংকায় নিশ্চয় মা মারীয়ার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

২. মিশর দেশে পলায়ন: শিশু যিশুকে রক্ষা করতে আপন ভূমি, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ ছেড়ে মা মারীয়াকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল মিশরে। কারণ যখন রাজা হেরোদ নতুন ইহুদি রাজার আগমন সংবাদ পেলেন, তখন তিনি রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় ২ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। ফলে বাধ্য হয়েই যোসেফ ও মারীয়া শিশু যিশুকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যান। প্রাণ ভয়, মৃত্যু-ভয়, পাহাড়ী ও কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ বেয়ে তারা মিশরে গেলেন। সেখানে বাস করতে লাগলেন শরণার্থীর মতো। এ যেন কালভেরীর পথে যিশুর পদযাত্রার পূর্বচ্ছবি!

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মানুষ যখন প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল তখন তাদের কেমন লেগেছিল? সেই মানুষেরাই জানেন স্বাধীন ভূমি হারিয়ে পরের বাড়িতে, পরের দেশে বেঁচে থাকাটা কতটা কষ্টের ও অসম্মানের। বর্তমান বিশ্বে শরণার্থীরা কেমন আছে? আমাদের যাদের বাড়ি-ঘর আছে সহায়-সম্পত্তি আছে, নিজস্ব ঠাঁই আছে, তারা হয়তো তাদের বেদনা পুরোপুরি বুঝতে পারবো না। কিন্তু শরণার্থীরাই জানে এবং তিলে তিলে উপলব্ধি করে আশ্রয়হীন থাকা কতটা কষ্টের বিষয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও অনেক শরণার্থী শিবির আছে, যাদের বাড়ি-ঘর নেই, নিজস্ব জায়গা নেই, যারা যিশুর মতই আশ্রিত ও পরাধীন। অন্যের অনুকম্পা ও করুণায় বেঁচে আছেন।

৩. বালক যিশুকে মন্দিরে খুঁজে পাওয়া: যিশুর ১২ বছর বয়সে যোসেফ ও মারীয়া যিশুকে নিয়ে জেরুসালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন নিস্তার পর্ব পালন করতে। ফিরতি যাত্রায় যিশু মন্দিরেই থেকে যান। কিন্তু পিতা-মাতা বুঝতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন যিশু আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই আছেন। পরে দেখা গেল যিশু তাদের সঙ্গে নেই! তাই তারা তড়িঘড়ি করে আবার জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। মনের মধ্যে আশঙ্কা, যিশুকে খুঁজে না পাওয়ার দুশ্চিন্তা এবং এই এতো কষ্ট করে হেঁটে যাওয়া- সবই মারীয়াকে বিদ্ধ করেছিল। শেষে খুঁজে পেয়ে আবার যিশুর মুখে শুনতে হয়েছিল "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকবো?" মা মারীয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, যিশু তার জন্য নন, তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে জগতে এসেছেন এবং তিনি সকল মানুষের জন্য।

কোন কিছু হারিয়ে গেলে আমাদের কেমন লাগে? সেটা যদি অনেক প্রিয় জিনিস হয়? নিশ্চয়ই খারাপ লাগে। আবার তা যদি নিজের সন্তান হয়? নিশ্চয়ই এর অনুভূতি প্রকাশ করা কঠিন। যখন কোন সন্তানকে কিডন্যাপ করা হয়, তখন তার পিতা-মাতা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন তাকে উদ্ধার করতে। যত টাকা লাগুক, যত দূরে যেতে হোক, তবুও তারা যেকোন কিছুর বিনিময়ে সন্তানকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন।

৪. কালভেরীর পথে যিশুর সাথে সাক্ষাৎ: এ পর্যায়ে মা মারীয়াকে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয়। তিনি দেখতে পান, যে সন্তানের গায়ে তিনি এতোটুকু আঁচড় লাগতে দেননি, সেই সন্তান সৈন্যদের বেদম প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত! আবার নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কালভেরীর পথে। একজন মায়ের পক্ষে এমন দৃশ্য দেখা কতটা কষ্টের?

আমাদের দেশে প্রায়শ্চিত্তকালে বিভিন্ন মিশনে জীবন্ত ক্রুশের পথ করা হয়। মানুষ অনেক ভক্তি নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। যিশুর ক্রুশ বহনের দৃশ্য দেখে অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়। আমার খুব মনে আছে, একবার আমার দাদা জীবন্ত ক্রুশের পথে যিশুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যখন তিনি কালভারীর পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে প্রহার করা হচ্ছিল রং মাখানো দড়ি দিয়ে। তার শুভ্র পোশাকে রক্তের দাগ পড়ছিল। তখন অনেকেই কাঁদছিলেন কিন্তু তবুও আমার চোখ পড়েছিল আমার মায়ের দিকে। মাকে দেখলাম, তিনি খুব গভীর অনুকম্পায় কেঁদে চলেছেন। এটি তো ছিল মাত্র একটি অভিনয়। কিন্তু মা মারীয়ার ক্ষেত্রে? সেটি তো অভিনয় ছিল না! তাহলে তার কেমন লেগেছিল? তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তার নিরপরাধ সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতে করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমিতে। একজন মা হিসেবে সন্তানের এমন করুণ পরিণতি মেনে নেওয়া এতো সহজ?

আমাদের সমাজেও নিজের স্বার্থে অন্যকে বিচারের মুখোমুখি করে নির্দয়ভাবে তার ওপর শাস্তির আঘাত আনা হয়। অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যের উপর অত্যাচার করে, অন্যায্যভাবে কঠিন শাস্তি দেয়। কিন্তু অনেক নিরুপায় মানুষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না, কিছুই বলার থাকে না। তাদের এমন নিরুপায় অবস্থা কতটা করুণ?

৫. ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে: যিশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। রোমীয় অনুশাসন অনুসারে যিশুর যুগে রোমীয় নাগরিক ব্যতিত অন্য সকল ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। যিশু যেহেতু রোমীয় ছিলেন না, সেহেতু তাকেও অন্য দুইজন চোরের মতো ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। মঙ্গলসমাচার অনুসারে আমরা জানি যে, ক্রুশের নিচে যিশুর কয়েকজন অনুসারীর সাথে মা মারীয়াও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তার নিরপরাধ সন্তান কিছু মানুষের স্বার্থের বলী হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যে সন্তানের গায়ে তিনি কোনদিন কোন আঁচড় লাগতে দেননি, সেই সন্তান আজ নির্দয়ভাবে বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, নিষ্ঠুর সৈন্যেরা তার জামা-কাপড় নিয়ে জুয়া খেলছে, হাসি-তামাসা করছে, অনেক বিদ্রুপকারী ঠাট্টা-মসকরা করছে!

নিজের সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখলে একজন মায়ের কেমন লাগে? কিন্তু কোন সন্তান যখন বিচারের মুখোমুখি হয়, তখন সকল পিতা-মাতাই চান তাদের সন্তানকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কারণ সন্তান যত বড় দোষই করুক না কেন, সে তো তাদের সন্তান! যিশু তো নিরপরাধ ছিলেন। তবুও তাকে লজ্জাজনকভাবে ক্রুশে ঝুলিয়ে দণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

৬. যিশুর মৃতদেহ কোলে লওয়াঃ যিশুর মৃত্যুর পর আরিমাথিয়ার যোসেফ ক্রুশ থেকে যিশুর মৃতদেহ নামান। মারীয়া তার স্নেহের সন্তানের ক্ষত-বিক্ষত নিথর শরীর কোলে নেন। তিনি দেখতে পান, তার সন্তানের গায়ে শত আঘাতের চিহ্ন, দুই হাত, দুই পা এফোড় ওফোঁড় হয়েছে, বর্শা দিয়ে বুক বিদ্ধ করা হয়েছে, হাজারো ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে সমস্ত শরীর। সন্তানের এমন বীভৎস চেহারা কোন মায়ের কাছে মেনে নেওয়ার মতো? মানুষকে কি এভাবে মেরে ফেলা যায়?

পৃথিবীর সকল পিতা-মাতাই চান নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তার সন্তান বেঁচে থাকুক। পাড়া-মহল্লা বা স্কুল-কলেজে কেউ সন্তানকে আঘাত করলে বা শিক্ষক বেত্রাঘাত করলে পিতা-মাতাগণ এর প্রতিশোধ বা প্রতিকার চাইতে কতো লম্ফ-ঝম্ফ করে থাকেন। ছেলে-মেয়েরা খেলতে খেলতে নিজেরা মারামারি করলেও অনেক সময় সেটিকে কেন্দ্র করে পিতা-মাতাগণ ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে যান; অনেক সময় সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলা-মকদ্দমা পর্যন্ত হয়ে যায়। তাহলে, নিজের নিরপরাধ সন্তানকে যখন নির্দয়ভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল, তখন মা মারীয়ার কেমন লেগেছিল?

৭. যিশুকে সমাধি দানঃ পরিস্থিতি এমন যে, যিশুর নিথর দেহ আর রাখা যাবে না। সন্ধ্যার আগেই সমাধিস্থ করতে হবে। কারণ মোশীর বিধান অনুসারে নিস্তার পর্বে বসতে হবে সকলকে। তাই আরিমাথিয়ার যোসেফ ও নিকোদিম তড়িঘড়ি করে যিশুকে ক্রুশ থেকে নামান। মা মারীয়া যিশুর নিথর দেহটি কোনভাবেই আর ধরে রাখতে পারেননি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এরপর যিশুকে সমাধিস্থ করে সমাধির মুখে বড় একটি পাথর সেঁটে দেওয়া হয়। এভাবে যিশুর সাথে মা মারীয়ার একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সন্তান আর রইল না।

কোন পিতা-মাতাই চান না নিজের সন্তানকে সমাধিস্থ করতে। কারণ তারা চান নিজে আগে মরতে। নিজ সন্তানকে সমাহিত করার মতো কষ্ট বোধহয় পিতা-মাতার আর কিছুতে নেই। কিন্তু মা মারীয়াকে নিদারুণ কষ্ট মাথা পেতে নিয়ে স্থির অবিচল থাকতে হয়েছিল।

মা মারীয়ার শোকের সাথে আমরা আমাদের শোকগুলো পাশাপাশি দেখতে চেষ্টা করেছি। যদিও আমাদের এ বুঝতে চাওয়া বা উপলব্ধিতে আনতে চেষ্টা করা কখনই সম্পূর্ণ নয়, তবুও আমরা বুঝতে চেয়েছি সেই সময়ে, সেই পরিস্থিতিতে মা মারীয়ার কেমন লেগেছিল। কী গভীর দুঃখ তাঁকে তিলে তিলে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। অথচ মা মারীয়া কী স্থির আর অবিচল ছিলেন! সাধু সিমেয়োন যে খড়্গের কথা মা মারীয়াকে বলেছিলেন, সেই খড়্গো মা মারীয়া তার জীবনে তিলে তিলে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তবুও মা মারীয়া ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। তাই এই সমস্ত আঘাত তিনি ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন। ফলস্বরূপ, ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করলেন। তিনি স্বর্গীয় আসন লাভ করে হয়ে উঠলেন স্বর্গের রাণী। এভাবে মা মারীয়ার জীবনের সমস্ত শোক পরিণত হয়েছিল অসীম সুখে। তাই আমাদের জীবনে যখন অন্যায় অবিচার আসে, জীবন যখন দুঃসহ বেদনায় জর্জরিত হয়, মেনে না নেওয়ার মতো পরিস্থিতি আসে, তখন যেন আমরা মা মারীয়াকে স্মরণ করি। তিনি কিভাবে ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে তার নিজের কর্তব্য পালন করে চলেছিলেন তা স্মরণ করি। পাশাপাশি, সবকিছুর অদৃষ্টে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে বিশ্বাস করে নিজেদের খ্রিস্টীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলি। কেননা, কে না জানে কষ্টের পরেই সুখ আসে, সাধনা করার পরেই আসে সুফল, কষ্টের শ্রমে বোনা বীজ একদিন দেয় শতগুণ ফল! তাই আমাদের নিজ নিজ ক্রুশ তথা ত্যাগস্বীকারের পথ বেয়েই এগিয়ে চলতে হবে স্বার্গীয় আনন্দের পথে। পুনশ্চ, ঈশ্বরের কৃপায় রোহিঙ্গারা নিশ্চয় একদিন তাদের বসতবাটি আবার ফিরে পাবে, পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে এবং নির্যাতিত, নিষ্পেশিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও উদ্বাস্তু মানুষেরা একদিন তাদের অধিকার লাভ করবে, তাদের বিগত দিনের সব কষ্ট তারা ভুলে যাবে। তাদেরও শোক পরিণত হবে সুখে॥

"যিশু তাঁদের বললেনঃ তোমরা এখন কোন নির্জন স্থানে গিয়ে নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকো, বিশ্রাম নাও।" মার্ক ৬:৩১

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের (বিডিপিএফ) বার্ষিক নির্জন ধ্যান- ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ
স্থানঃ খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী
নির্জনধ্যান পরিচালকঃ ফাদার ফ্রান্সেসকো রাপাচোলি পিমে

দল	তারিখ	স্থান
১ম দল	২৬ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ আগমনঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যায় প্রস্থানঃ ১ অক্টোবর, শনিবার সকাল	খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী
২য় দল	৩ অক্টোবর- ৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ আগমনঃ ৩ অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় প্রস্থানঃ ৮ অক্টোবর, শনিবার সকাল	খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী

নির্জন ধ্যানের এই বিশেষ সময়ে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করার জন্য।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার মিন্টু এল পালমা
প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফাদার উইলিয়াম মুর্মু
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফাদার রুবেন এস গমেজ
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/২৫৪/২২

মারীয়ার সপ্তশোকের বাইবেলীয় ভিত্তি এবং মারীয়া সংক্রান্ত কিছু অনুধ্যান

রাসেল আন্তনী রিবেরু

মারীয়া ছিলেন নাজারেথ গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে যাকে ঈশ্বর তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় মনোনীত করে ঐশ প্রসাদে পূর্ণ করেছিলেন। ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা সংঘটিত ও পূর্ণ করতে মা মারীয়া অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি যিশুকে গর্ভে ধারণ করেছেন, লালন-পালন করেছেন, মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন, এমনকি ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। যিশু খ্রিস্টের সারা জীবনের আনন্দ বেদনায় প্রথম এবং প্রধান সহচরী ও সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর মা মারীয়া। মারীয়া বিশ্বাসের পথে এগিয়ে চলে যিশুর মুক্তিদায়ী কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছেন। এ জন্যই মারীয়া ছিলেন যিশুর প্রথম শিষ্যা।

মারীয়ার সপ্তশোক

মা মারীয়ার গোটা জীবনটাই ছিল বিভিন্ন দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার। মা মারীয়ার সপ্তশোক মুক্তির ইতিহাসে মা মারীয়ার অনন্য ভূমিকার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মা মারীয়ার সপ্তশোকের ভিত্তি পবিত্র বাইবেলে পাওয়া যায়। পবিত্র বাইবেলে মা মারীয়ার সপ্তশোকের বিবরণ রয়েছে।

১ম শোক: সিমিয়োনের ভবিষ্যৎ বাণী: যিশুর জন্মের ৪০ দিন পর ইহুদী ধর্মীয় প্রথানুসারে উৎসর্গের চিহ্নস্বরূপ প্রভুর চরণে নিবেদন করতে মারীয়া ও যোসেফ যিশুকে মন্দিরে নিয়ে যান। সিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করেন ও ভাববাণী করে শিশুটির জননী মারীয়াকে বলেন, "এই যে শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকের পতনের কারণ, আবার অনেকের উত্থানেরও কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন, যার ফলে অনেকেরই গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে! .... আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে" *(লুক ২:৩৪-৩৫)*। এই খড়্গ হচ্ছে মা মারীয়ার জীবনের দুঃখপূর্ণ পথের প্রতীক। সিমিয়োনের এই উক্তি মা মারীয়ার সমগ্র জীবনের দুঃখ-কষ্টের ইঙ্গিত প্রদান করে। এভাবেই যিশুর সমস্ত কষ্ট মারীয়া তাঁর জীবনে হৃদয়াঙ্গম করেন।

২য় শোক: মিশর দেশে পলায়ন: প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ যিশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে যাওয়ার পর প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন: "ওঠ! শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক! কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্যে শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে। যোসেফ তখন উঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন। হোরেদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন *(মথি ২:১৩-১৫)*।"

চরম প্রতিকূল পরিবেশে কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই মা মারীয়া যিশুকে রক্ষা করতে ও

ঐশ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত মানুষ ও দেশভূমিতে গিয়েছিলেন এবং পথে নিশ্চয় এই ছোট শিশুকে সঙ্গে নিয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। নিজের আত্মীয় পরিজন, পরিচিত জায়গা ছেড়ে প্রবাসে থাকতে নিজ জীবনে ও হৃদয়ে মা মারীয়া বিভিন্ন দুঃখ, যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগ করেছিলেন।

৩য় শোক: মন্দিরে যিশুকে হারানো: ১২ বছর বয়সী বালক যিশুকে মন্দিরে হারিয়ে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হৃদয়ে দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে মারীয়া যোসেফের সঙ্গে তিনদিন যিশুর খোঁজ করেছিলেন। পবিত্র বাইবেলে পাই: "উৎসবকালের শেষে তাঁরা যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন, তখন বালক যিশু জেরুসালেমেই রয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতে পারলেন না। যিশু সহযাত্রীদের সঙ্গেই আছেন মনে ক'রে তাঁরা পুরো একদিনের পথ এগিয়ে গেলেন, তারপর আত্মীয়স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন *(লুক ২:৪৩-৪৫)*।" তাঁরা তখন তাঁকে মন্দিরে পণ্ডিতদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে আলোচনারত দেখতে পান। এ বিষয়ে তিনি তাদের বলেছিলেন তোমরা কি জানতে না আমার পিতার গৃহেই আমাকে থাকতে হবে। তাঁরা কিন্তু যিশুর এই কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। যিশুর মাতা সব কথা হৃদয়ে গেঁথে রেখেছিলেন *(দ্র. লুক ২:৪৬-৫১)*।

৪র্থ শোক: যিশুর ক্রুশ বহন দর্শন: "নিজের ক্রুশ বহন ক'রে যিশু বেরিয়ে পড়লেন 'খুলি-তলা' বলে পরিচিত জায়গাটির দিকে হিব্রু ভাষায় সেই জায়গাটির নাম 'গলগথা' *(যোহন ১৯:১৭)*। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ না থাকলেও প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে, কালভেরীর পথে ভারী ক্রুশ বহনে মারীয়া যিশুকে অনুসরণ করেছেন, বিশ্বাসপূর্ণ ভাবে পুত্রের যন্ত্রণাময় পথে নিজেও হেঁটেছেন এবং স্নেহের পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মণ্ডলীতে প্রচলিত 'ক্রুশের পথে'র প্রার্থনায় প্রচণ্ড দুঃখপূর্ণ ও আবেগিক এই বিষয়টি পাওয়া যায়: "যিশু উঠিয়া আবার ক্রুশ স্কন্ধে লইয়া চলিতে লাগিলেন। পুত্রের মুখ শেষবার দেখিবার আশায় রাস্তার মোড়ে থাকিয়া স্নেহময়ী জননী যখন পুত্রের এই অবস্থা দেখিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে কি ভীষণ দুঃখের শেল বিঁধিল। কে এই দুই হৃদয়ের ব্যথার কথা বর্ণনা করিতে পারে?"

৫ম শোক: যিশুর ক্রুশারোপন ও মৃত্যু দর্শন: "সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল আর তাঁর সঙ্গে অন্য দু'জনকে– একজনকে এ-পাশে আর একজনকে ও-পাশে, আর যিশুকে মাঝখানে। ..... এদিকে যিশুর মা, তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপাসের স্ত্রী মারীয়া এবং মাগ্দালার মারীয়া তখন ক্রুশের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে এবং তাঁর পাশে সেই যে-শিষ্য, যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, তাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে যিশু মাকে বললেন: "মা, ঐ দেখ, তোমার ছেলে!" তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন: "ঐ দেখ, তোমার মা! *(যোহন ১৯:১৮-৩০)*।"

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ঐতিহ্যগত ছবিতে আমরা দেখি কুমারী মারীয়াকে যিনি ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। যিশুর দুঃখদায়ী ও যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে কুমারী মারীয়া ও তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহনই ছিলেন। যিশুর আত্মোৎসর্গের সাথে মারীয়াও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর হৃদয় যেমন বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হয়েছিল তেমনি মা মারীয়ার মাতৃহৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়েছিল। কালভেরীর উপরে কুমারী মারীয়া নিজপুত্রের দুঃখের পরিত্রাণদায়ী মমতার অংশীদার হয়ে উঠেন কারণ তিনি পুত্রের "হ্যাঁ"-র সাথে নিজের "হ্যাঁ" যুক্ত করেন। মা মারীয়া ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে দুঃখ-বেদনায় ব্যথিত ভক্তদের মমতাময়ী মা হয়ে ওঠেন এবং এক আধ্যাত্মিক মাতৃত্বের বন্ধনে তাদের আগলে রাখেন।

৬ষ্ঠ শোক: ক্রুশ থেকে যিশুর মৃতদেহ নামানো এবং মারীয়ার কোলে স্থাপন: "যোসেফ তখন একটি ক্ষোম-কামড় কিনে আনলেন। তারপর তিনি যিশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে সেই ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন ... *(মার্ক ১৬:৪৬; দ্র. মথি ২৭:৫৭-৫৯; লুক ২৩:৫০-৫৩; যোহন ১৯:৩৮-৪০)*।" আরিমাথিয়ার যোসেফ ও নিকোদেম যিশুর দেহ ক্রুশ থেকে নামানোর পর তা শোকার্তা জননীর কোলে স্থাপন করেন। পবিত্র বাইবেলে সরাসরি এটির উল্লেখ না থাকলেও পুণ্য ঐতিহ্য ও ভক্তি অনুসারে এটি বিশ্বাস করা হয় কেননা মঙ্গলসমাচার থেকেই আমরা জানি যে মারীয়া ও অন্য নারীরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন এবং এটা কতই না বাস্তবসম্মত যে মার কোলে তাঁর একমাত্র স্নেহের পুত্রকে মৃত্যুর পর স্থাপন করা!

৭ম শোক: যিশুর সমাধি: যিশুর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মা মারীয়ার কর্মমুখর উপস্থিতি ছিল। তিনি তাঁর পুত্রের ক্রুশীয় যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছেন। তাই বলা যায় যে, তিনি যিশুর সমাধি দানেরও সাক্ষী ছিলেন। "যে-জায়গায় যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটি বাগান আর বাগানের মধ্যে একটি নতুন সমাধিগুহা, যেখানে এর আগে কাউকে কখনো রাখা হয়নি। সেদিন ইহুদীদের পর্বের প্রস্তুতি-দিবস ছিল ব'লে এবং ঐ সমাধিগুহাটি কাছে ছিল বলে তাঁরা যিশুকে সেখানেই শায়িত করলেন *(যোহন ১৯:৪১-৪২)*।"

প্রতি বছর তপস্যাকালে মা মারীয়ার শোকের এই দিকটি গভীরভাবে অনুধ্যান করার সুযোগ পেয়ে থাকি। যখন আমরা ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করি তখন ১৪শ স্থানে মারীয়ার এই শোকটি গভীরভাবে ফুটে উঠে যখন বলা হয়: ".....তখন বুকে বড় একখানি পাথর চাপা দিলে যেইরূপ কষ্ট হয়, কুমারী মারীয়ার মনেও ঠিক সেইরূপ কষ্ট হইল।"

মা মারীয়া সংক্রান্ত অনুধ্যান

মারীয়া ঈশ্বর কর্তক সম্মানে ভূষিত

ঈশ্বর নিজে ৪টি উপায়ে মারীয়াকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। প্রথমত, মুক্তিদাতার মা হিসেবে বেছে নিয়েছেন; দ্বিতীয়ত, এই ভূমিকার প্রস্তুতি স্বরূপ মারীয়াকে 'প্রসাদপূর্ণা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন; তৃতীয়ত, ২ বার পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ করেছেন - ক. দূতের সাথে সাক্ষাৎ খ. পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে; চতুর্থত, খ্রিস্টের যন্ত্রনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এভাবে মারীয়া হয়ে উঠেছেন মানব ইতিহাসে ও মুক্তি পরিকল্পনায় সবচেয়ে আশীর্বাদিত নারী।

মারীয়া নামক বিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ

মারীয়ার বিদ্যালয়ে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ না করলে আমাদের শিক্ষা পূর্ণ হয় না। যিশু নিজেও এই বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন এবং মা মারীয়ার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মা মারীয়া হ্যাঁ বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি প্রভুর দাসী"। যিশুর জীবনেও যিশু পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে মুক্তি পরিকল্পনায় হ্যাঁ বলতে পেরেছিলেন। চরম কষ্ট-যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনার মধ্যেও যিশু তাঁর মায়ের মতই বলেছেন, "পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। তাদের কথার মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। মারীয়া যেন যিশুকে সাজিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজে সঙ্গে সঙ্গে থেকে যিশুকে প্রস্তুত করেছেন। যিশুর প্রকাশ্যে জীবনের পূর্বে তিনি প্রতিটি মুহূর্তে যিশুকে শিখিয়েছেন এবং প্রস্তুত করে তুলেছেন।

আমাদের জীবনের ব্যথা-বেদনায় মা মারীয়া

কুমারী মারীয়া আমাদের সকলের মা হয়ে আমাদের সকলের জীবনের আনন্দ, বেদনা, হতাশা, আশা-নিরাশা অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণে আলোর দিশারী হিসেবে আমাদের পাশে রয়েছেন পরম সঙ্গিনী ও সহায়িকা রূপে। মা মারীয়ার সমগ্র জীবন, কাজ, ধ্যান-ধারণা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা সবই ছিল ঐশরাজ্যের জন্য নিবেদিত। তাই শুচিতা, দরিদ্রতা ও বাধ্যতায় মারীয়া পরমেশ্বরের আদরিণী কন্যা, পুত্রের স্নেহময়ী জননী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সকলের বিশেষ করে অভাবী, গরীব, দীন-দুঃখী, অসহায় মানুষের সঙ্গিনী হিসেবে তাঁর পুত্রের কাছে মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেন এবং আমাদের দুঃখ-ব্যথা-বেদনার সময় আমাদের সাহায্যকারী ও সঙ্গিনী হয়ে পুত্রের নিকট অনুনয় করে থাকেন।

খ্রিস্টভক্তদের জীবনে শ্রেষ্ঠ উপহার মা মারীয়া

মারীয়া আমাদের জন্য যিশুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার এবং যিশু নিজে আমাদের এই উপহার দিয়ে গেছেন। মারীয়া তাঁর জীবনে হয়ে উঠেছিলেন যিশুর সর্বশ্রেষ্ঠা শিষ্যা। তিনি ছিলেন জ্বলন্ত আদর্শ ও আলোস্বরূপ যা প্রতিনিয়ত আমাদেরকে স্বর্গের দিকে চালিত করে। মুক্তি পরিকল্পনায় এটা আমাদের সামনে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠে যে, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্বলতার অন্ধকারে সন্তান সর্বস্ব হারালেও মা মারীয়ার হৃদয়ে সন্তানের স্থান সর্বদাই উন্মুক্ত ও মঙ্গলময়। মা মারীয়া সকল কষ্টকে জয় করার উজ্জ্বল আদর্শ দেখিয়েছেন। সাধু আগস্টিনের মত আমরাও বলতে পারি যে, "মারীয়া হচ্ছেন খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহের সব সদস্যের জননী কারণ সমুদয় বিশ্বাসীর পুনর্জন্মে তিনি খ্রিস্টরূপ মস্তকের সাথে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করেছেন।" এ কারণেই তাঁকে মণ্ডলীর সর্বোৎকৃষ্ট এবং অনন্যসাধারণ অঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি হচ্ছেন বিশ্বাসে ও প্রেমে মণ্ডলীর মূর্ত প্রতীক। তিনি নম্রতা, বিশ্বাস, আশা ও জ্বলন্ত প্রেমের মাধ্যমে দীন-দরিদ্র, অসহায়, পাপী, রোগী তথা সবার সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী হয়ে আমাদের জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে মুক্তিদাতার সাথে এক অভিনব উপায়ে সহযোগিতা করছেন। মা মারীয়া হলেন একটি আয়নার মত যেখানে সকল অবস্থায় সকলের জন্য আত্মনিবেদনের আলো প্রতিফলিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে চিরদিন-চিরকাল।

শোকার্তা জননী মারীয়ার পর্বে মা মারীয়া আমাদের সবাইকে তাঁর পুত্রের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করুন যেন আমরা দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, অভাবগ্রস্ত, হতাশা, নিরাশায় জর্জরিত মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারি এবং বর্তমান যুগের নারীর প্রতি চলমান সমস্ত সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

২. কস্তা, দিলীপ এস.: **প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা,** প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০।

৩. খালকো, পলাশ যোসেফ ও রাসেল আন্তনী রিবেরু: মুক্তি পরিকল্পনায় মা মারীয়ার ভূমিকা, দীপ্ত সাক্ষ্য ১ম ও ২য় সংখ্যা, ৪৬ বর্ষ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা।

৪. মঙ্গলবার্তা বাইবেল॥

ধর্মপ্রদেশ ও বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

ড. ফাদার মিন্টু এল পালমা

খুব সংক্ষেপে বলছি তিনটা মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট নিয়ে একটি ধর্মপ্রদেশ সৃষ্টি হয়। আর তা হলো প্রথমত: একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী; দ্বিতীয়ত: তাদের পালকীয় আধ্যাত্মিক যত্ন নেবার জন্য একজন ধর্মপাল (বিশপ) এবং তৃতীয়ত: যাজকশ্রেণী যাদের সহায়তায় ধর্মপাল (বিশপ) এই পালকীয় ও আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক সেবা দান করেন। যে-ই বিশপ হিসাবে ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ (Diocesan Bishop)। আর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হলো খ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর সেবা কাজের জন্য একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি। যিনি সাধারণত একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রদেশের সেবা কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার কর্তৃপক্ষ (Ordinary) হলো ঐ ধর্মপ্রদেশের বিশপ যাকে ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ বলা হয়। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক পুরোপুরিভাবে তার বিশপের প্রতি আনুগত্য থেকে তার উপর ন্যাস্ত নির্দিষ্ট সেবা কাজ করেন। তাদের কাজের পুরোটাই জনগণকে নিয়ে, জনগণের সাথে, জনগণের মধ্যে ও জনগণের জন্য। ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ মণ্ডলীর Hierarchy- তে সরাসরি সম্পৃক্ত।

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ সংঘ বা Association করতে পারেন। মণ্ডলীর আইন বিধি অনুসারে তাদের জন্য এই সুযোগ রয়েছে যা ধর্ম-ব্রতধারীদের জন্য নেই। এইরূপ সংঘের মাধ্যমে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ আরো সুসংবদ্ধভাবে চলতে, ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনাকে আরো সুদৃঢ় রাখতে, পরস্পরের প্রতি সময়, সমর্থন, সহযোগিতা-সহভাগিতা ও প্রার্থনায় একসঙ্গে যাত্রা করেন। নিঃসঙ্গতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের চর্চা করেন এবং যাজকীয় জীবনকে আরো পবিত্র, আনন্দময় ও প্রাণবন্ত রাখেন। যেহেতু ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর মত Community Life নেই তাই তাদের জন্য মণ্ডলীর অনুমোদিত Fraternity বা Association করা একটা সুন্দর উপায় ও সুযোগ।

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)- এর প্রতিষ্ঠা

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রমনা সাধু যোসেফ ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে সারা বাংলাদেশের তখনকার ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের এক জাতীয় সভা-সম্মেলনে তখনকার সময়ের যুবক ফাদারগণ, বিশেষ করে ফাদার জের্ভাস রোজারিও, ফাদার পেট্রিক গমেজ ও আরো কয়েকজন মিলে ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমাকে (প্রয়াত) জাতীয় পর্যায়ে সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের নিয়ে একটা ভ্রাতৃসংঘ করার প্রস্তাব করেন। পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত যুবক ফাদারদের এই বিচক্ষণ ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ধারণা ও ভাবনাটাকে তিনি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে একটা সভা ডাকেন। ফাদারদের উপস্থিতিতে সার্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তখনকার মুরুব্বি ফাদার ফিলিপ ডি'রোজারিও- কে (চিটাগাং) সভাপতি, ফাদার মার্কুস মারান্ডি-কে (তখনকার দিনাজপুর) সহ-সভাপতি এবং ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা- কে (ঢাকা) সেক্রেটারী করে একটা এড হক (Ad hoc) অর্থাৎ তদর্থক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেন। এভাবে পরবর্তীতে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার বাংলাদেশ বিশপ সম্মেলনী (সিবিসিবি)- এর অনুমোদনে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)- এর জন্ম ও যাত্রা শুরু। এড হক কমিটির এই তিনজনই এই বিডিপিএফ- এর প্রথম সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তারা তিনজনই এখন স্বর্গবাসী। ঈশ্বর তাদের আত্মার চির শান্তি দান করুন।

যাজকসংঘ (Association) করার মাণ্ডলিক প্রেরণা ও পরামর্শ

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, এই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দেই সর্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। আর সেটা হলো পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল এই ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দেই সংশোধিত আকারে কোড অফ ক্যানন ল (Code of Canon Law) ঘোষণা করেন। যেখানে ভাতিকান মহাসভার দলিলের অনেক সিদ্ধান্তের আইনি রূপ দেন। উল্লেখ্য যে ভাতিকান মহাসভার দলিল 'যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনাবলী' (Presbyterorum Ordinis)- তে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের যাজকসংঘ (Association) করার নির্দেশনা ও পরামর্শ রয়েছে (PO ৮)। এই নির্দেশাবলীই ১৯৮৩-র ক্যানন ২৭৮ ধারায় আইনীভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, "ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের যাজকসংঘ (Association) করার অধিকার রয়েছে সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যা যাজকীয় জীবনের জন্য মানানসই এবং প্রযোজ্য"। আর যাজকদের জীবনে যথাযোগ্য প্রযোজ্য যে উদ্দেশ্য তা ক্যানন ২৭৮, ২ ধারায় বলা হয়েছে, "ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ পূর্ণ শ্রদ্ধা ও মহত্ত্ববোধ নিয়ে সেইসব যাজকসংঘভুক্ত হন যা বিশেষ করে তাদের কর্তৃপক্ষ ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ কতৃক অনুমোদিত এবং যেখানে উৎকৃষ্ট ও উত্তম জীবনমান ও নীতিবোধ নিয়ে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা দানের মাধ্যমে যাজকগণ তাদের পালকীয় সেবাকাজে পবিত্রতার উৎকর্ষ সাধনে রত থাকেন এবং তাদের কর্তৃপক্ষ বিশপ ও তাদের পরস্পরের মধ্যে একত্রিত ও মিলনাবদ্ধ যাজকীয় জীবন লালন ও ধারন করেন"। সর্বজনীন বিশ্ব মণ্ডলীতে সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের জন্য প্রৈরিতিক মিলনসমাজ (Apostolic Union of the Clergy) নামে একটা আন্তর্জাতিক মৈত্রীসংঘ (International Confederation) রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে "যাজকদের এই প্রৈরিতিক মিলনসমাজ ধর্মপ্রদেশীয় অভিষিক্ত যাজকদের জন্য উন্মুক্ত দ্বার, যারা আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের সেবাকাজের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহায়তা দানে তা বাস্তবায়িত করতে পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ। এর বৈশিষ্ট্যগত উপাদান মৌলিক ভ্রাতৃত্বের উপর সংস্থাপিত ও প্রোথিত যা সংস্কারীয় অভিষেক থেকে উদ্ভুত, যাতে করে তারা প্রেরিত শিষ্যদের মিলনসমাজের Model দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ও পালকীয় দয়া ও সেবা প্রকাশের মাধ্যমে মণ্ডলীতে ও পরস্পরের মধ্যে এক মিলন-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন" (Statutes AUC, 1)।

বিডিপিএফ -এর সংবিধান ও দর্শন

মণ্ডলীর দলিল, আইন ও AUC-র ধারণাগুলো ধারণ করে 'বিডিপিএফ সংবিধান' যে দৃষ্টিপথ ধরে চলার দর্শন নিয়েছেন তা হলো, "উত্তম মেষপালক প্রভু যিশুখ্রিস্টের জীবন দৃষ্টান্ত অনুসরণে, স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের সাথে একাত্ম ও সংযুক্ত হয়ে, ঐশজনগণের সেবায় নিবেদিত জীবনের এই যাত্রায় পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে ও জনগণের পরিত্রাণের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যাজকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক এই ত্রিবিধ সেবাযজ্ঞে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত ও প্রতিশ্রুত এক জীবন দর্শন" (সংবিধান, নং ৩)। এই লক্ষ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো: ১) একে অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পারস্পারিক জীবন সহভাগিতায় অনুপ্রেরণা দান; ২) তাদের মধ্যে একতা, সংহতি ও মিলন অক্ষুন্ন রাখতে ও তা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান; ৩) মঙ্গলবাণী প্রচার ও পালকীয় সেবা কাজে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দান; ৪) পবিত্র জীবন-যাপনে ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতা দান; ৫) তাদের পারস্পারিক পালকীয় কাজের সহভাগিতা করে পরস্পরকে পালকীয় কাজে ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ করা ও অনুপ্রাণিত করা; ৬) নিজ ধর্মপ্রদেশ ও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীর পালকীয় পরিকল্পনা অনুসারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা এবং পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করা; ৭) একাকীত্বের জীবন ও অন্য

সকল সম্ভাব্য প্রতিকূল ও বিপদ ও শঙ্কাপূর্ণ অবস্থা থেকে রক্ষা করা ও প্রার্থনাপূর্ণ সহায়তা দান করা; ৮) ক্যানন ল্ (Canon law) ধারা ২৭৩ থেকে ২৮৯-এ উল্লেখিত যাজকীয় বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি নিষেধগুলো মেনে চলতে পরস্পরকে সহায়তা দান করা ও নৈতিক ও মানবিক গুণগুলো বৃদ্ধিতে পরস্পরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা (সংবিধান নং ৫)

কার্যকরী পরিষদ ও তাদের সেবা দায়িত্ব

যাজকীয় অভিষেকের মাধ্যমে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ এই জাতীয় যাজকসংঘের (Association) সদস্য হন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি ধর্মপ্রদেশে ২৮৫ জনের উপর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সারা বাংলাদেশের এই স্থানীয় মণ্ডলীতে এবং দেশের বাইরে অন্য কয়েকটি দেশে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক হয়ে স্ব-স্ব স্থানে থেকে তাদের সেবা কাজ করে যাচ্ছেন। সংবিধানের ধারা ৭-এ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের করণীয় মার্গগুলোর উল্লেখ রয়েছে। সব কিছুরই মধ্যে এই যাজকসংঘের যে মূলমন্ত্র ও দায়িত্ব হলো প্রতিজন যাজক প্রার্থনা ও প্রেরণা দানে পরস্পরের সাথে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখতে সদা সক্রিয় থাকেন।

বার্ষিক সাধারণ মিলন-সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে ৩ বৎসরের জন্য জাতীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত (গঠিত) হয়। জাতীয় পর্যায়ে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারীর সাথে প্রতিটা ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (Diocesan Priest Fraternity DPF) থেকে সভাপতি ও সেক্রেটারী নিয়ে পূর্ণ কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ বছরব্যাপী বেশ কয়েকটা বৎসরিক কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনা করে থাকেন।

ক) জাতীয় পর্যায়ে বাৎসরিক নির্জন-ধ্যানঃ মণ্ডলীর বিধান ২৭৬, ৪ -এ উল্লেখ আছে, 'যাজকগণ বাৎসরিক নির্জনধ্যান করতে দায়বদ্ধ যা নিজেদের অর্থ্যাৎ স্থানীয় মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে তা পরিচালিত হবে'। এটা বাধ্যতামুলক। এই লক্ষ্যে বিডিপিএফ দুটা দলে ভাগ করে এই নির্জনধ্যানের আয়োজন করেন। যেহেতু ২৮০ উপর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক রয়েছেন তাই জায়গা ও আয়োজনের সুবিধা ও অসুবিধার কথা ভেবে দু'টি দলে তা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই নির্জনধ্যান পুরো ৪ দিনের জন্য হয়ে থাকে তাই যাজককে এর জন্য প্যারিশ-প্রতিষ্ঠান থেকে এক সপ্তাহের জন্য বাইরে থাকতে হয়।

খ) বাৎসরিক সাধারণ মিলন-সভাঃ এটা পুরো আড়াই দিনের প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটা শুধু বাৎসরিক রিপোর্ট ও আলোচনা সভায় নয় বরং এই বাৎসরিক মিলন সভায় গুরুত্ব পায় যাজকদের পালকীয় কাজ ও জীবন এবং মণ্ডলীর সমসাময়িক শিক্ষা ও পরিকল্পনাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে সফল ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের জ্ঞানে-জ্ঞাপনে, মনন ও কর্ম-প্রেরণে সমসাময়িকায়ন করা। মণ্ডলীর সমসাময়িক ঘোষিত দলিল-পত্রগুলো এবং বাৎসরিক বিভিন্ন মূলসুরগুলো আরো গভীরভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশেষজ্ঞ যাজকগণ রিসার্স পেপার প্রস্তুত করে হাউজ-তা উপস্থাপন করেন। এটাকে আসলে সভা-মিটিং-এর উর্ধ্বে মিলন-সভা হিসাবে দেখা হয় কারণ এখানে যাজকগণ পরস্পরের সাথে তাদের জীবন ও কাজ সহভাগিতা করার সময় ও সুযোগ পান ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো সক্রিয় ও সুদৃঢ় করার প্রেরণা লাভ করেন।

গ) নবায়নী শিক্ষা-অনুক্রম (Refresher Course): প্রতি বৎসর যাজকদের জন্য অভিষেক বৎসর ভিত্তিক বিভিন্ন দলে নবায়নী শিক্ষা কার্যক্রম অয়োজন করা হয়। বিশেষ করে কয়েক বছরের মধ্যে অভিষিক্ত যাজকদের জন্য এই কোর্সটা নির্ধারিত থাকে। তাছাড়াও যারা অনেক বৎসর ধরে যাজকীয় জীবন-যাপন করেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পালকীয় কাজে সেবা দিয়ে আসছেন তাদের জন্যও এই ব্যবস্থা করা হয়। ৩ থেকে ৪ দিনের জন্য এই কোর্সের ব্যবস্থা। পালকীয় কাজে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতালব্ধ ভালো-মন্দ বিষয়গুলো, চ্যালেঞ্জগুলো, সামাজিক, সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পালকীয় বিচিত্র বিষয়গুলো সহভাগিতাসহ আরো সময়োপযোগী অনেক বিষয়ে Paper উপস্থাপন করা হয়। **ঘ) ষাণ্মাসিক প্রকাশনীঃ সংযোগঃ** বিডিপিএফ বছরে দুটা সাময়িকী (Issue) প্রকাশ করেন। এই সাময়িকী-র নাম হলো 'সংযোগ'। সংযোগ হলো সম্পর্ক, মিলন, যোগাযোগ, মনোযোগ মৈত্রীযোগ অর্থ্যাৎ যার মাধ্যমে পরস্পর সাথে যোগাযোগ রাখা, সংযুক্ত থাকা, মনোযোগী হওয়া, সহযোগী ও সহভাগী হওয়া এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলনাবদ্ধ থাকা। এই সংযোগে একটা বছরের শেষে বিজয় দিবস, বড়দিন, নববর্ষকে কেন্দ্র করে এবং আর একটাতে বৎসরের মধ্যে বাৎসরিক সাধারণ মিলন-সভাকে কেন্দ্র করে। উভয়টাতেই ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ের যাজকদের পালকীয়, আধ্যাতিক ও সেবাকর্মের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও ঘটনাবহুল তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন জনের জ্ঞানগর্ব ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও নব-অভিষিক্ত যাজকদের জীবনী ও জুবিলী পালনকারীদের জীবনীও সংযোগে স্থান পায়।

ডি. পি. এফ (Diocesan Priest Fraternity)

এই ডি পি এফ হলো প্রতিটা ধর্মপ্রদেশে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের ভ্রাতৃসংঘ। এখানে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে একজন সভাপতি ও একজন সেক্রেটারী থাকেন। তারা যাজকদের দ্বারা নির্বাচিত বা বাছাইকৃত হন। তাদের সাথে ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা (Vicariate) ভিত্তিক একজন করে প্রতিনিধি থাকেন। এভাবে তারা ডি পি এফ এর বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা করে থাকেন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে যাজকদের প্রয়োজনে সেটা হোক তাদের আর্থিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক এবং পালকীয় ও সংস্কারীয় বিষয় নিয়ে তারা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা ও সহভাগিতা করতে আন্তরিক থাকেন।

ভ্রাতৃত্বের চর্চায় সঙ্গ-শুভেচ্ছাচার অনুষ্ঠান

এই যাজকসংঘের দর্শন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে নির্ধারিত কর্ম-পরিকল্পনাগুলো ছাড়াও ভ্রাতৃত্বের নান্দনিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার কিছু চলমান আচারিক সংযোগ-সাধন চর্চা রয়েছে। যাজকদের জন্মদিন, যাজকীয় অভিষেক দিন, প্রতিপালকের পর্ব দিনগুলোতে প্রার্থনা-শুভেচ্ছা জানানো। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও পাল-পুরোহিতদের প্রতিপালক সাধু জন ভিয়ান্নীর পর্ব ধর্মপল্লী, আঞ্চলিক ও ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে অর্থপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা। অঞ্চল ভিত্তিক যাজকগণ বৎসরে কয়েকবার একসাথে মিলিত হয়ে প্রার্থনা ও পালকীয় ও সংস্কারীয় কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন সহভাগিতা করেন ও পবিত্র আরাধনায় সময় কাটান। তাছাড়া গ্রুপভিত্তিক যাজকগণ তাদের সুবিধা মত কোথাও ভ্রাতৃভ্রমণে যান।

বাংলাদেশে ধর্মপ্রদেশীয় ও অন্য সম্প্রদায়ের যাজকগণ প্রায় সবায়ই বর্তমানে একই আতুরঘর বনানী জাতীয় উচ্চ সেমিনারী থেকে জাত। যাজক হওয়ার পর ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ যার যার ধর্মপ্রদেশে তাদের সেবাজীবন শুরু করেন। শুরু হয় কর্ম জীবনের ব্যস্ততা। বাস্তবতার কারণেই কমে যায় যোগাযোগ, খোঁজ-খবর। তার উপর আবার কেউ কেউ প্যারিশে একা থাকেন। কোন কোন জায়গায় হয়তোবা সর্বোপরি দু'জন। এইরূপ কর্মব্যস্ততার জীবনে যাজকগণ একাত্ম থেকে একায়, সঙ্গ থেকে নিসঙ্গতায়, সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্নতায় সেবার এক কর্মব্যস্ত জগত-জীবনে জড়িয়ে পরেন। জনগণ তার Community হলেও এক্ষেত্রে একজন যাজকের কাছে একজন যাজকই, পাশের যাজকই, সহপাঠী যাজকই কিন্তু তার ভাই, বন্ধু, সঙ্গী, সহযাত্রী, সমর্থক, রক্ষক, অভিভাবক ও অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শক। এটাই Fraternity। এটাই যাজকীয় পারিবারিকতা। এভাবেই এই ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ একা থাকলেও নিসঙ্গ নয়, দূরে থাকলেও বিচ্ছিন্ন নয়, কর্মব্যস্ত থাকলেও নিরস্ত নয়, দূর-সীমান্তে থাকলেও কারো কাছ থেকে অজান্তে নয়। এখানেই বিডিপিএফ-এর সৌন্দর্য, মহত্ব ও নির্মল ভ্রাতৃত্ব।

বিগত ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বিডিপিএফ-এর প্রতিষ্ঠার ৩০ বৎসরের জুবিলী পালিত হয়েছে। এখন এর ৪০ বৎসর চলছে। এর প্রথম দিকের ইতিহাসটা খুব একটা সুখকর ছিলো না। অনেক প্রতিকূলতা ছিলো। সেইগুলো ছিল বলেই এই যাজকসংঘটি দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে। স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশপ সম্মিলনীর যাজক ও ধর্মব্রতী-ব্রতীনিদের কমিশনে (EC-CR) -এ বিডিপিএফ ও বিসিআর এই দু'টি অরগ্যান বিশপদের সাথে জাতীয় মৈত্রীবন্ধনে থেকে ত্রিবিধ সেবাযজ্ঞে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন॥

স্বপন বেঁচে আছে তার সেবায় ও কাজে আমাদের মাঝে

ড. আলো ডি'রোজারিও

ঢাকায় আমার ছাত্রাবস্থার প্রথম দিকে যে কয়জন প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ খুব তাড়াতাড়ি আমার মনের মানুষ হয়ে যায় তাদের মধ্যে স্বপন অন্যতম। স্বপন, যার পুরো নাম স্বপন খ্রীষ্টোফার পিউরীফিকেশন, তখন থাকতো নারায়ণগঞ্জে। আমি থাকতাম পুরনো ঢাকাতে। তো স্বপনের সাথে দূর হতে আমার প্রাথমিক পরিচয় হয় ঢাকা আসার আগেই, লেখালেখির কারণে, সাপ্তাহিক **প্রতিবেশীর** মাধ্যমে। তার সাথে সামনা-সামনি সময় নিয়ে ভালোভাবে পরিচয় ঘটে নটর ডেম কলেজে, ছাত্র কল্যাণ সংঘের বার্ষিক কার্যক্রম- প্রতিভার অন্বেষণ শীর্ষক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলাকালে। এর আগে একদিন ক্ষণিকের জন্যে দেখা হয়েছিল পুরনো ঢাকার রোকনপুরে, স্বপন তখন তার নারায়ণগঞ্জের দলবল নিয়ে আমার কাছে এসেছিল তাদের ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা চাইতে। আমি সেসময় অবাক হয়ে ভাবতাম - কী করে স্বপন, খোকন, আশা, হিউবার্টসহ নারায়ণগঞ্জের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশংসনীয় যুব কার্যক্রম চালাবার পাশাপাশি ঢাকা এসে শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দাপট চালায় আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার জিতে নিয়ে যায়!

সুপ্রিয় স্বপনের সাথে আমার সখ্যতা গভীর হয় সেই সময়টায় যেই সময়ে আমি ছাত্র কল্যাণ সংঘের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলাম। এই দায়িত্বের একটা প্রধান কাজ ছিল- সংগঠনের নিয়মিত মুখপত্র **অনল** বের করা। তখন আমরা মুখপত্রটির বেশিরভাগ সংখ্যাই বের করতাম সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কপি করে, বছরে দু'একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হতো মুদ্রিত আকারে। একটু আধটু লিখতে পারলেও সেসময়ে আমি টাইপ করতে পারতাম না, স্টেনসিল কাটতে পারতাম না, সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কপি করতে পারতাম না, প্রুফ দেখা তখনো শিখিনি, মুদ্রণ কাজের অন্যতম প্রধান উপকরণ কাগজের ধরন ও সাইজ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। বয়সে ছোট হয়েও স্বপন এইসব বিষয় কীভাবে জানি তখন বেশ ভালোভাবেই জানতো। আমি এইসবের কিছু কিছু শিখতে শুরু করেছিলাম স্বপনের কাছ হতে। লেখা দেয়াসহ সম্পাদনা ও মুদ্রণ বিষয়ে স্বপন তখন আমাকে কী যে সহায়তা করেছে- কী আর বলবো। আমার অনভিজ্ঞতা স্বপন তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সামলে দিয়েছিল।

স্বপনের সাথে আমার সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হয় শ্রদ্ধেয় ফাদার টিম সিএসসি'র সাথে বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনে কাজ করার সময়। সে তখন কাজ করছিল মাণ্ডলিক কার্যক্রম- ওয়াইসিএস (YCS) ও কাথলিক যুব সেবাদলে (CYST)। তখনো বিশপীয় যুব কমিশন গঠন করা হয় নি। আমাদের উভয়ের কর্মস্থল ছিল কারিতাস বাংলাদেশ-এর শান্তিবাগস্থ প্রধান কার্যালয় চত্বরে। স্বপনের সম্পাদনায় তখন বের হতো যুব সেবাদলের মুখপত্র-**যুবদৃষ্টি** ও ওয়াইসিএস-এর মুখপত্র-**নবকল্লোল**। শ্রদ্ধেয় ফাদার টিমের সহায়তা

স্বপন খ্রীষ্টোফার পিউরীফিকেশন

নিয়ে আমার সম্পাদনায় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের মুখপত্র হিসেবে ইংরেজীতে **হটলাইন নিউজলেটার** (Hotline Newsletter) ও বাংলায় **ন্যায্যতা** বের করা হতো। এই দু'টি মুখপত্রই দ্বিমাসিক হিসেবে নিয়মিত বের করা হতো। নব্বই দশকের প্রথমার্ধের সেই সময়টাতে স্বপন ও আমি একসাথে উঠাবসা করেছি, প্রেসে গিয়েছি প্রুফ দেখতে, জিপিও-তে গিয়েছি শত শত পত্রিকার কপি পোস্ট করতে, সময় পেলে অফিস-শেষে সিংগাড়া বা পুরী খেতে খেতে আড্ডাও মেরেছি। আমরা দু'জনে সকাল আটটার মধ্যে অফিস শুরু করতাম আর শেষ করতাম রাত আটটা/নয়টা নাগাদ। যার যার অফিসে আমরা সব ধরনের কাজ নিজেরাই করতাম- ঝাড়ু দেয়া থেকে শুরু করে হিসাব রাখা পর্যন্ত। বাসায় ফেরার জন্যে আমাদের কেন জানি কারো কোনো তাড়াই থাকতো না। পড়া, লেখা, শেখা ও কাজ করাই ছিল আমাদের তখনকার ধ্যান ও জ্ঞান।

কারিতাস চত্বরে সেই সময়ে স্বপনের সাথে কাজ করা শেষ করেছি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। কারণ সেবছর আগস্ট মাসে আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলাম পড়াশুনা করতে। স্বপনের সাথে কাজ করতে করতে জেনেছি ও শিখেছি– কীভাবে কম খরচে ও খুব তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র ও পত্রিকা ডাকযোগে পাঠানো যায়। স্বপন আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল জিপিও'র অভ্যন্তরের একটি অনুবিভাগ যেখানে গেলে চিঠি পোস্ট করতে লাইনে দাঁড়াতে হয় না, ডাকমাশুলও কম লাগে। সেই জায়গা চেনার আগে আমি অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়ায়ে থাকতাম, একসাথে অনেকগুলো চিঠি ও পত্রিকা পোস্ট করতাম বলে লাইনে আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকজনদের বকাও খেতাম। স্বপনের আরো একটা বিষয় যা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। আর সেটা হলো- মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নিপুণতা। আমার জানামতে এই বিষয়ে স্বপনের সমকক্ষ তখন আর কেউ খ্রিস্টান সমাজে ছিলেন না। সেকথা ঢাকার মধুবাগের মধুবন প্রিন্টার্সের কাশেম ভাইও স্বীকার করতেন। স্বপন ও আমি একসাথে মধুবন প্রিন্টার্সে কত যে কাজ করিয়েছি! কাশেম ভাই আমাকে প্রায়ই বলতেন, "প্রেসের কাজ আপনাদের খ্রিস্টান সমাজে স্বপনই সবচেয়ে ভালো জানেন।" স্বপন আমাকে শিখিয়েছে- Space ও Font কিছুটা হেরফের করলে কীভাবে পৃষ্ঠা সংখ্যা বা ফর্মা কমে বা বাড়ে, ফলে খরচও পরিবর্তন হয়। স্বপন কাগজে হাত দিয়েই বলে দিতে পারতো- কী কাগজ, কোন্ দেশের, কত গ্রাম ওজনের, সম্ভাব্য দাম, ইত্যাদি। কাগজের এই ব্যাপার-স্যাপার আমি তখন তেমন বুঝতাম না, এখনো যে খুব বুঝি তা-ও না।

যুক্তরাষ্ট্রে পড়াকালে আমার যেই দুইজনের সাথে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ ছিল তার মধ্যে স্বপন একজন। তখন মুঠোফোন ছিল না, ল্যান্ডফোনে কথা বলার সুযোগ ও টাকা-পয়সা আমার ছিল না। আমাদের যোগাযোগ ছিল হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে। আমার হবু স্ত্রী শিউলীকে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি চিঠি লিখতাম। স্বপনকে লিখতাম প্রতি মাসে একটি। স্বপনের লেখা চিঠির মাধ্যমে আমি দেশের অনেক খবরই পেতাম, বিশেষ করে লেখালেখি সংক্রান্ত। বিভিন্ন ম্যাগাজিনের জন্যে স্বপন লেখা চাইলে আমি পাঠাতাম। সেই

সময়কার বহুলপঠিত সাপ্তাহিক **বিচিত্রায়** আমার লেখা ছেপেছে কী না, সাপ্তাহিক **প্রতিবেশীতে** আমার পাঠানো লেখা ঠিক মতোন পৌঁছেছে কী না, বড়দিন ও পাস্কাপর্বে কয় কয়টি ম্যাগাজিন ঢাকা বা এর আশেপাশের এলাকা হতে বের হলো, কে কে লিখলো- এইসব খবর বিস্তারিত সে চিঠিতে লিখে পাঠাতো। মাঝে-মধ্যে লোক-মারফত কিছু কিছু ম্যাগাজিন ও আমার জন্যে স্বপন পাঠিয়ে দিত। সেসব পেয়ে আমি খুব খুশী হতাম। গ্রাহক হবার কারণে আমি যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে **প্রতিবেশী** নিয়মিত পেতাম। কোন লেখা ছাপা হলেই আমার জন্যে সেই সংখ্যা **বিচিত্রা** পাঠাতো স্বপন। সম্ভবত সেই সময়ে স্বপন **কলমী** নামের একটি মিনি ম্যাগাজিন বের করতো। আমি তাতে নিয়মিত লেখা পাঠাতাম।

যুক্তরাষ্ট্রে পড়া শেষে দেশে ফিরে কারিতাসে কাজ শুরু করার পর স্বপনের সাথে সম্পর্ক নানা কারণে ভাটা পড়ে। তন্মধ্যে মূল কারণ- কাজের জন্যে মাসের বেশিরভাগ সময় আমার ঢাকার বাইরে থাকা, আর ঢাকায় থাকলেও অফিস শেষে একাধিক টিউশনি করা। ইতোমধ্যে স্বপনও চাকুরী পাল্টায়, পার্ট-টাইম ব্যবসা শুরু করে। পরে আবার সে চাকুরীটাও ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকালীণ ব্যবসায়ী হয়ে যায়। এই সময়টায় মাঝেমধ্যে দেখা হলে আমরা আলাপ করতাম– "স্বপন, তোমার বাসায় তো একদিন আমার যাবার কথা, তাই না? আমার জন্যে তুমি কী কী জানি জমা করে রেখেছো? তো কবে আসবো?" একটু হেসে স্বপন বলতো- "আপনি আসবেন আসবেন বলতে বলতে আমি তো নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে ঢাকা এসে গেলাম। আপনার জন্যে জমা করে রাখা পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোও সাথে করে ঢাকা নিয়ে এসেছি। জানি না, কবে আপনে সময় পাবেন আসতে। তো সময় করে আইসেন। আসবার আগে জানায়েন। "বড়ই আফসোসের বিষয় আমার আর স্বপনের বাসায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমার অনুরোধে তার সংগ্রহে থাকা পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোও আনা হয় নি।

স্বপন যেখানে ও যেভাবেই থাকুক না কেন ডাকলেই কাছে পেতাম পরামর্শের জন্যে। অসুস্থ অবস্থায়ও কয়েকবার চলে এসেছে আমাদের কারিতাস অফিসে। আসার পর চেহারা দেখে ও কথা বলে যখন বুঝতে পারতাম সে অবস্থায় আমার ডাকে তার আসা উচিত হয়নি, তখন আমি বলতাম- "স্বপন, তুমি বললেই পারতে আজ না পরে আসবা।" স্বভাব সুলভ হাসি দিয়ে স্বপন বলতো- "আপনি ডাকলে না এসে কী আমি পারি? আর আপনার ডাকে না আসলে যে আমারই বেশি খারাপ লাগে।" এমনি ধরনের আলাপ হয়েছে বেশ কয়েকবার, এখন মনে পড়ে, যখন আমরা শ্রদ্ধেয় ফাদার টিমের লেখা শেষ বইটি চূড়ান্ত করছিলাম। বইটির নাম- Master of Disaster: the Outstanding Role of Caritas Bangladesh, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৮৬, প্রকাশনায়- কারিতাস বাংলাদেশ, মুদ্রণে- স্বপন খ্রীষ্টোফার পিউরীফিকেশন, সুপ্রকাশ প্রিন্টার্স, ঢাকা। স্বপনের সাথে এটাই ছিল আমার শেষ কাজ।

কর্মপলক্ষ্যে বিদেশে থাকাতে স্বপনকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি। স্বর্গীয় পিতার ডাকে আমাদের কাঁদিয়ে স্বপন পরপাড়ে চলে যায় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বরে। তবে মনে পড়লেই যে আমিস্বপনকে এখনো দেখি। আমি দেখি তার হাসি হাসি মুখ। শুনি তার বিনয়ে ভেজা মিষ্টি সুরের ডাক- "আলোদা"। মৃত্যু মানুষকে নিঃশেষ করে না, অশেষ করে মাত্র। স্বপন এক অশেষ আলোকবর্তিকা, অকৃপণভাবে আলো ছড়ায়ে আমাদের পথ দেখাবে, যেমনটা দেখাতো সে যদি বেঁচে থাকতো। জেনে আমি খুব খুশী যে পারিবারিক উদ্যোগে স্বপনের স্বপ্নের বোনা ফসল রূপ লেখাগুলো এক মলাটের ভেতর আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বপনের স্ত্রী মলি গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে জানালো তারা চেষ্টা করছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে স্বপনের লেখার সমাহারে একটি বই বের করতে। আমার বিশ্বাস, স্বপনের সেইসব লেখায় তার আদর্শ ও মূল্যবোধ আমরা খুঁজে পাবো। স্বপনের আদর্শ ও মূল্যবোধ নিরন্তর ছুঁয়ে দিক আমাদের হৃদয়॥

শ্যামল গ্যাসপার স্মরণে

ইউজিন শ্যামল গমেজ (গ্যাসপার)
জন্ম : ২৭ অক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বাকির খাতায়

কখনও শান্ত কখনও অশান্ত এ মন
যে ভাবে চলছে, সে ভাবে চলুক জীবন।
বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে হবে বলে,
হায় ঈশ্বর যে চলে গেছে
জানি সে আর ফিরবেনা।
তার জন্য কেন এত কষ্ট হয় মনে?
পৃথিবী চলছে তার নিজের নিয়মে
আমার সময় থেমে আছে তার
চলে যাওয়ার সময়ের বাঁধা ফ্রেমে।
কত কথা জানার ছিল
কত কথা বলার ছিল
সবকিছু বাকির খাতায় রয়ে গেল।

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সেবক, দেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, নাট্যকার ও লেখক, ধর্মানুরাগী ও ভালবাসার মানুষ।
দেখতে দেখতে চারটি বছর পেরিয়ে গেল, আজও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। তোমার কাজের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাই, তোমার পরিবারের মাঝে। তাই বিশ্বাস করি তুমি ছিলে তুমি আছ তুমি থাকবে। তুমি স্বর্গ থেকে তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ কর, তারা যেন তোমার মত আদর্শ প্রার্থনাপূর্ণ উদার মনের মানুষ হতে পারে।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : পূর্ণিমা গমেজ
ছেলে : অভিষেক গমেজ, **ছেলে বউ :** চৈতি গমেজ
মেয়ে : সেবা ডি'কস্তা, **মেয়ে জামাই :** জুয়েল ডি'কস্তা
নাতি: অর্ক ডি'কস্তা ও ঋত্তিক গমেজ
নাতিন : অর্পা ডি'কস্তা ও রোজ গমেজ
দিদি সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি

বিজ্ঞ/২৫৬/২২

বন্ধুত্ব

জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও

"আয় আর একটিবার আয়রে সখা
প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুঃখের কথা কব
প্রাণ জুড়াবে তায়,"

হ্যাঁ ঠিক এই গানটার মতনই মিষ্টি মধুর একটি সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এদের পরে সাধারণত সমবয়সীদের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অটুট বন্ধনটিই বন্ধুত্ব নামে পরিচিত।"বন্ধু দিবস ঘোষণার উৎপত্তি বা কারণ ঠিক কী তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশৃঙ্খলা ও হিংস্রতা মানুষের মধ্যে অনেকটাই বন্ধুর অভাব তৈরি করেছিলো বলে অনেকের অভিমত। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সরকার এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। দিনটি ছিল আগস্টের প্রথম শনিবার। তার প্রতিবাদে পরদিন ওই ব্যক্তির এক বন্ধু আত্মহত্যা করেন। এরপর থেকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে বন্ধুদের অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে আমেরিকায় কংগ্রেসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আগস্টের প্রথম রোববারকে বন্ধু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। বন্ধু দিবস বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখে পালন করা হয়। তবে এখনও বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আগস্টের প্রথম রোববারই বন্ধু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে *(উইকিপিডিয়া)*। যখন থেকে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলে যাওয়া শুরু করি ঠিক তখন থেকেই পরিবারের বাইরে এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে বেড়ে ওঠা, আমাদের খেলাধুলার সঙ্গী যে কখন আর একটা নির্ভরতার জায়গাতে পরিণত হয় তা নিজেরাই বুঝতে পারিনা। নিজের গোপন সব কথা মন খুলে বলার একটাই নির্ভরতার নাম বন্ধু। এই বন্ধুই এক সময় নিজেদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে ওঠে। এই বন্ধুর হাত ধরেই তৈরি হয় শতশত রঙিন স্মৃতি। স্কুলের মাঠে খেলাধুলা, স্কুলের বাইরে ফুচকা খাওয়া, আইসক্রিম ভাগ করে নেওয়া আরও কত কি! একটা খুনসুটি লেগেই থাকে প্রিয় বন্ধুর সাথে। তবে সমবয়সী এই বন্ধুদের সাথেই যে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তেমনটা কিন্তু নয়। বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাধারণত যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করে থাকি তা হলো মনের মিল, পারস্পরিক বোঝাপড়া। একটা নির্ভরতার আশ্রয়। যার কাছে আমার সমস্তটা নিরাপদ। সমবয়সীদের বাইরেও এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা গড়ে উঠতে পারে মা-বাবা, ভাই-বোন কিংবা সমবয়সী অন্য ভাই-বোনদের সাথে। মা-বাবার পরে আমাদের শিক্ষকদের সাথেও একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মা-বাবা আমাদের নিয়ে খুব চিন্তিত থাকেন। অজান্তেই তাদের এই দুঃশ্চিন্তার রূপ নিয়ে নেয় কড়া শাসনে। আমাদের অনেকের কাছেই বিশেষ করে সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করা ছেলে-মেয়েদের কাছে মা-বাবার এই কড়া শাসন খুব খারাপ লাগতে থাকে। আমাদের মনে হতে থাকে যে, বাবা কিংবা মা আমাকে বুঝতে পারছেনা কিংবা আমাদের আগের মতন আর ভালোবাসেনা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। তাদের কারণেই আজ আমরা এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ দেখতে পেয়েছি। তাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আমরা। যার সাথে তারা কোন কিছুর বিনিময়ের কথা ভাবতেই পারেনা। কিন্তু অল্প বয়স কিংবা বোঝাপড়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সময় থাকতে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনা। আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে তৈরি হওয়া সম্পর্কটা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে থাকে। একজন শিক্ষক সবসময় তার ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। তিনি সবসময় চান তার ছাত্ররা যেন নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষকদের সাথে তৈরি হওয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একজন ছাত্রের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। একজন ছাত্র তার পড়ালেখার পাশাপাশি জাগতিক সমস্ত কিছু যখন নির্দ্বিধায় বলতে পারে তখন একজন শিক্ষক তার সার্বিকভাবে যত্ন নিতে পারে। তাকে ভালো মন্দের জ্ঞান দিতে পারে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন আমরা অনেক বেশি আধুনিক, সভ্য এবং দ্রুতগামী। মুঠোফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে আরেক প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। ফেইসবুকের মাধ্যমে নতুন নতুন বন্ধু বানাতে পারি। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিজের অজান্তেই ভুল কিছু মানুষের সান্নিধ্যে চলে আসি। খারাপ সঙ্গে পড়ে যাই। বয়সের অপরিপক্কতার কারণে না বুঝেই ভুল করে ফেলি। এটা বর্তমানে খুব সাধারণ একটা সমস্যা। তাই এই বন্ধুত্ব নিয়ে প্রচলিত একটি প্রবাদ হচ্ছে-

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।" অর্থাৎ জীবনে বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা সাবধানতা প্রয়োজনীয়। জীবন চলার পথে আমাদের জীবনে এমন অনেক বন্ধুই হয় যারা প্রকৃত বন্ধু নয়। আমাদের এই জিনিসটা সবসময় বুঝতে হবে যে, আমাদের প্রকৃত বন্ধু সে ঠিক আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, শিক্ষকদের মতন আমাদের ভালোটাই চাইবে। খারাপ যে কোন কিছু থেকে সে আমাদের দূরে থাকতে বলবে। প্রকৃত বন্ধু কখনোই আমাদের অসৎ কিংবা খারাপ বিষয়ে প্ররোচনা দিবেনা এবং উৎসাহিত করবে না। অনেক সময় আমরা না বুঝে অনেক ভুল করে থাকি। একজন প্রকৃত বন্ধু কখনোই তার বন্ধুকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়না এবং বিপদের দিনে তাকে রেখে পালিয়েও যায়না। আমরা যদি এমনই এক নিঃস্বার্থ, নির্ভরতার আশ্রয় চাই, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই তবে একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমরা তা পেতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। কারণ একমাত্র তিনি রয়েছেন যার কাছে আমাদের সবকিছু সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের কথাগুলো ঈশ্বরের সাথে বলতে পারি। এই প্রার্থনা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। যার ফলে আমরা অচিরেই মন্দ সকল কিছু হতে নিজেকে দূরে রাখতে পারি। এমনকি এই নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে আমরা এক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারি। পবিত্র বাইবেলেও আমরা এর প্রমাণ পেয়ে থাকি। ঈশ্বর একাধিকবার মানুষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন। কারণ তিনি চান আমাদের বন্ধু হতে। আমরা তার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টের সঙ্গেও এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। আমরা নিশ্চয়ই এই গানটির সাথে কম বেশি সকলেই পরিচিত

"তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী
অন্ধকারে তুমি যে মোর পথ দেখানো বাতি"।

ঠিক তাই, আমাদের অন্ধকার পাপময় জীবনে একমাত্র তিনিই পারেন আলোকিত করতে, আমাদের খারাপ সময়ে আমাদের পাশে থাকতে।

আসুন, আমরা সকলে মিলে এক নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলি পরস্পরের সাথে এবং খ্রিস্টীয় প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে জীবন যাপন করি॥

ত্যাগেই আনন্দ

প্রাপ্ত আলফন্স রোজারিও

একদিন মুখর নামে একটি ছেলে স্কুল শেষ করে দুপুরে বাড়ি ফিরছিল। দিনটি ছিল খুবই গরম। সারাদিন ক্লাশ করে সে খুব ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত ছিল। তাই সে মনে মনে ঠিক করল বাড়িতে গিয়েই মাকে বলবে তার জন্যে খাবার প্রস্তুত করে দিতে। যেতে যেতে সে যেন সারা দুনিয়ার কথা চিন্তা করছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় সে একশত টাকার একটি নোট রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। প্রথমে সে টাকাটি নিতে দ্বিধাবোধ করল। কিন্তু পরে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। আশে-পাশে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল তার দিকে কেউ লক্ষ্য রাখছে কিনা। এরপরে সে টাকাটি কুড়িয়ে নিল। টাকাটা পাবার পর সে খুবই আনন্দিত হলো। নিজের উপার্জনের নয়, বাবার কাছ থেকে চেয়ে নয় কিংবা উপহার হিসেবে নয় বরং এটা ছিল তার প্রথম কুড়িয়ে পাওয়া টাকা। তাই সে মহাখুশি।

টাকাটি পাবার পরে সে এতো খুশি ছিল যে তার শরীর থেকে ক্লান্তি ভাবটা যেন নিমিষেই কেটে গেল। এরপর সে ভাবতে শুরু করল টাকাটি সে কি কাজে ব্যয় করবে। বা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে সে উপকৃত হবে। সরল মনে চিন্তা করতে শুরু করল যে টাকাটি দিয়ে সে হোটেলে গিয়ে ভালো কিছু খাবে, নাকি কোনো খেলনা কিনবে, নাকি স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের খাওয়াবে। সে কিছুতেই স্থির কারতে পারছিল না টাকাটি দিয়ে সে কি করবে। বিষয়টি নিয়ে সে দোটানায় পড়ে গেল। সে খুবই ক্ষুধার্ত ছিল তাই অবশেষে সে স্থির করল হোটেলে গিয়ে সে ভালো কিছু খাবে। উৎফুল্ল মনে নাচতে নাচতে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিল। কিন্তু হোটেলের সামনে যেতেই সে দেখতে পেল একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক সেখানে পড়ে আছে। ভিক্ষুকটি কাতর স্বরে মিনতি জানাল "বাবা আমি চার দিন ধরে কিছু খাইনি, অনেক ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও না বাবা।" লোকটির জন্য সে তার মনে কষ্ট অনুভব করল। ভিক্ষুকটির জন্যে তার মায়া হলো। মুহূর্তের মধ্যেই মুখর হোটেলে গিয়ে খাবার ইচ্ছে ভুলে গেল। সে কুড়িয়ে পাওয়া টকাটি দিয়ে ভিক্ষুকটির জন্যে কিছু খাবার কিনে আনল। সে তাকে (ভিক্ষুকটিকে) বলল, "দাদু এই খাবারটুকু আমি তোমার জন্যে এনেছি, তুমি খেয়ে নাও।"

এতে তিনি অনেক খুশি হলেন এবং আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি অনেক বড় হও খোকা মানুষের মতো মানুষ হও ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ।" বয়স্ক লোকটিকে সাহায্য করে নিজের অজান্তেই কখন যেন তার চোখে আনন্দের জল চলে এলো। মুখর উপলব্ধি করতে পারল ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করার আনন্দ।

আমরাও পারি আমাদের ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার এর মাধ্যমে অন্যের পাশে দাঁড়াতে। আমাদের আশে পাশে এমন অনেক অবহেলিত ভাই-বোন রয়েছে যারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মাধ্যমে যেমন এই অবহেলিত মানুষগুলো উপকৃত হবে, তেমনি পৃথিবীটা আরও অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে॥

অবহেলা

সপ্তর্ষি

যাকে জীবনের অতি গুরুত্ব দিয়েছি
ভালবেসেছি অন্য সকলের চেয়ে বেশি
সে যেন আজ হয়েছে অচেনা একজন
আমি যেন তার অবহেলার
অপ্রিয় মানুষ।

সুন্দর সেই গোলাপ ভেবে হাতে নিয়ে
আদর করে বুকে জড়িয়ে ছিল মোরে
শুকনো হলে ফেলে দিল পায়ের তলে
অন্য এক মানুষ আপন করে নিয়ে।

ভেসেছি আমি যখন সুখের ভেলাতে
সময় দিয়েছে আমার নিত্য সঙ্গী হয়ে
দুঃখের সময় ফেলে গেল একা করে
কাঁদতে হলো আমাকে একা নীরবে।

সুখ নামের সেই ময়না পাখিটি
হয়তো আর আসবে না ফিরে
আমার মনের ছোট্ট কুড়ে ঘরে
দুঃখ হয়ে বাস করবে স্মৃতিতে।

ভালবাসার পরিণামে উপহার হিসেবে
পেলাম আমি সস্তা দু'চোখের নোনা জল
তাই, জীবনে সবকিছু মেনে নেওয়া যায়
প্রিয়জনের অবহেলা যায় না সহ্য করা।

দীক্ষাগুরু যোহন

মার্সেল কান্টা

ধর্ম শহীদ যোহন
সদাপ্রভুর প্রিয়জন
আত্মজ্ঞানে সাক্ষ্যদানে, তুমি বিচক্ষণ।।
উটের চামড়ার বস্ত্র গায়ে
শীর্ণ দেহ নগ্ন পায়ে,
আগমনের মহান ঘোষক
সন্ন্যাসী রতন।।
জর্ডন নদীর বিজন কুলে--
বাণীর সুধায় হৃদয় খুলে,
যিশুর নামে দীক্ষা নিলে, হাজার ভক্তজন।।
তুমি যিশুর দীক্ষাগুরু, নব সন্ধির যাত্রা শুরু,
স্বর্গ পিতার অভয় মন্ত্রে, মুগ্ধ সবার মন।।
তোমার দীপ্ত বিবেক বাচন,
হেরদ রাজার রোষের কারণ,
মঙ্গল আলোর মশাল জ্বেলে,
জীবন বিসর্জন।।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো)লিমিটেড

The Central Association of Christian Co-operatives (CACCO) Limited

(স্থাপিত: ১ মে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং-০৫, তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

ফোন: ০২-২২৩৩১৪০০৪, মোবাইল: ০১৭৯৬-২৩২০১৬, ই-মেইল: caccoltd@gmail.com

সূত্র নং - কাক্‌কো/সিএস/২০২২-১২৮ তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমিটেড-এ নিম্নে বর্ণিত পদে নিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে যোগ্য খ্রীষ্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাবলী :-

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	কাক্‌কো লিঃ-এর পে-স্কেল অনুযায়ী	❖ ব্যবসায় শাখা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেশনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে উল্লেখিত পদে নূন্যতম ৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৩ মাস সর্বসাকুল্যে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মাত্র / আলোচনা সাপেক্ষে বেতন প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
২	অফিসার-অডিট	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	কাক্‌কো লিঃ-এর পে-স্কেল অনুযায়ী	❖ হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেশনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অডিট করার কাজে নূন্যতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৩ মাস সর্বসাকুল্যে ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র / আলোচনা সাপেক্ষে বেতন প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
৩	অফিসার-প্রশিক্ষণ	০১ টি	পুরুষ/মহিলা	কাক্‌কো লিঃ-এর পে-স্কেল অনুযায়ী	❖ যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। ❖ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অপারেশনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। ❖ সমবায় সমিতি আইন, বিধি-উপবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ❖ বয়স ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হতে হবে (অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। ❖ সমবায় সমিতিতে বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানে নূন্যতম ৫বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ❖ প্রবেশনারি পিরিয়ড ৩ মাস সর্বসাকুল্যে ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র / আলোচনা সাপেক্ষে বেতন প্রদান করা হবে। ❖ অফিসের প্রয়োজনে যে কোন সময় যে কোন স্থানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী

১. ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান ঠিকানা, চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ) ধর্ম, ঝ) জাতীয়তা, ঞ) ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক ও মোবাইল নম্বর উল্লেখসহ আবেদনপত্র আগামী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৫ টার মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইল/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ পত্রের অনুলিপি, জাতীয়তার সনদ পত্র, চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৪. প্রবেশনারি পিরিয়ড ৩ মাস। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর কাক্‌কো লিঃ -এর বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে।

৫. আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ এবং সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে।

৬. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাতকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।

৭. কোন প্রকার তদবির বা সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

১০. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্‌কো) লিমেটেড
নীড়২৮, ৭৪/১ (২য় তলা), মনিপুরীপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
E-mail:caccoltd@gmail.com

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
চেয়ারম্যান, কাক্‌কো লিঃ

ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারী, কাক্‌কো লিঃ

বিজ্ঞ/২৬১/২২

ন্যায় ও শান্তি কমিশনের কর্মশালা

ফাদার সাগর কোড়াইয়া ▯ পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র 'লাউদাতো সি' এ্যাকশন প্লাটফর্মের আলোকে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ কনফারেন্স, মোহাম্মদপুরে বাংলাদেশ ন্যায় ও শান্তি কমিশনের অর্ধদিবসব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের ৭ বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনার সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ ন্যায় ও শান্তি কমিশন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করে। বাংলাদেশ ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি, এশিয়া কারিতাসের প্রেসিডেন্ট ড. আলো ডি'রোজারিও, ৮টি ধর্মপ্রদেশের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের আহ্বায়ক ও সদস্যদের অংশগ্রহণে ২৭ আগস্ট সকাল ৮:৩০ মিনিটে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লী, সেমিনারী, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংঘ-সমিতি, পরিবার তথা ব্যক্তি পর্যায়ে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের ৭ বছরব্যাপী 'লাউদাতো সি এ্যাকশন প্লাটফর্ম' স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

'পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানবাধিকার ও ন্যায্যতা বিষয়ক ধারণা ও কর্মকৌশল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা' মূলভাবের ওপর আলোচনা করেন ড. আলো ডি'রোজারিও। বর্তমান পৃথিবীর নানাবিধ বৈশ্বিক সমস্যার মধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, সিলেটের চা শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা আদায় বিষয়গুলো আমাদের ভাবায় এবং এ নিয়ে কাজ করার বিষয়ে তিনি তার আলোচনায় তুলে আনেন। অংশগ্রহণকারীদের মুক্তালোচনায় ধর্মপ্রদেশভিত্তিক ন্যায় ও শান্তি কমিশনের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র ওঠে আসে। এছাড়াও 'তালিথা কুম' আন্দোলনের সাথে 'তালিথা কুম বাংলাদেশ' যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নারী ও শিশুদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে তা আলোকপাত করা হয়। 'তালিথা কুম বাংলাদেশ' ঢাকার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মপ্রদেশেও সিস্টারদের অংশগ্রহণে কার্যপরিধি বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়॥

রাণীখং সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

ফাদার নিপুণ দফো ▯ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, রাণীখং- এ "সিনডীয় মণ্ডলীতে যুবদের করণীয় ও দায়িত্ব" এই মূলসুরের উপর যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যুব সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফিদেলিস নেংমিঞ্জা পাল-পুরোহিত রাণীখং মিশন, ফাদার গাব্রিয়েল জি. মোমিন, এসডি, ফাদার নিপুণ দফো, দুইজন সিস্টার, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ৯৬ জন। অতঃপর ফাদার ফিদেলিস নেংমিঞ্জা প্রার্থনায় ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে স্মরণ করে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। পরিচয় পর্বের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের মূল অংশে চলে যায়। "বর্তমান বাস্তবতায় (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ) যুব সমাজের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় এই বিষয়ের আলোকে সহভাগিতা করেন ফাদার ফিদেলিস নেংমিঞ্জা। তিনি বলেন, যুব সমাজ যে কোন সমাজের, জাতির প্রাণশক্তি। তারাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, দেশের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মহান স্থপতি, শিল্পী, শান্তির অগ্রদূত। সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও যুগলক্ষণ গুলো আলোকপাত করেন।

বিরতির পর ফাদার গাব্রিয়েল জি মোমিন পালকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সেমিনারের মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি আরও উৎসাহিত করেন, গারো জাতিসত্তা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে রাখতে হলে নিজস্ব ভাষাকে ধরে রাখার আহ্বান জানান। সেই সাথে যুবদের আহ্বান করেন কালের স্রোতে যেন ভেসে না যায়। মিশ্র বিয়ের অন্য জাতির সাথে চলে না যায়। সেই সাথে যুবদের এক সাথে পথ চলার জন্য বলেন। তারপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের খাবারের পর দলীয় আলোচনা ও সহভাগিতা করেন। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সেমিনার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ লিঃ

অডিট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য, সমিতি অংশীদার/দেনাদার, পাওনাদার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত অডিটদল সমিতির ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক বিধিবদ্ধ অডিট কাজ সমিতির কার্যালয়ে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ করা হবে। কাজেই সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নিজ নিজ হিসাবাদি সমিতিতে রক্ষিত হিসাবের সাথে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে মিলিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে সমিতি কর্তৃক রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করে অডিট কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য এ ব্যাপারে পৃথকভাবে কোন যাচাই পত্র ইস্যু করা হবে না।

(মুহাম্মদ মিজানুর রহমান)
উপ-নিবন্ধক (অডিট, আইন ও সমিতি)
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা
ও
দলনেতা, অডিটদল
দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস্ লিঃ

বিজ্ঞ/২৬০/২২

শ্যামলের মহাশান্তির রাজ্যে গমনের ১১তম বার্ষিকী

প্রয়াত শ্যামল গমেজ
জন্ম : ১৭-০৭-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯-০৯-২০১১ খ্রিস্টাব্দ

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

"আজো মনে হয় ভাই তুমি আছো আমাদেরই মাঝে
আমরা দেখি তোমায় সকল কাজে
জানিনা কেন তুমি এতো আগে চলে গেলে
আমাদের কথা কি একটুও মনে হয়না?

চলে গেলে তোমার একমাত্র সন্তান ঐশ্ব, স্ত্রী ও ভাই-বোন এখানে ফেলে।"

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো ৯ সেপ্টেম্বর। আমাদের ভাই শ্যামল ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের মায়ার বাঁধন কেটে চলে গেলো না ফেরার দেশে। দেখতে দেখতে কিভাবে যে ১১টি বছর কেটে গেল তা বুঝতে পারিনি। মনে হয় তুমি এখনো আছো আমাদের মাঝে। এই দিনটি বার বার তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমাকে আমরা কখনো ভুলতে পারিনি, পারবোও না। তোমার এই বিদায় দিনে আমরা মনে গভীর কষ্ট-বেদনা নিয়ে তোমাকে স্মরণ করি। প্রতি মুহূর্তে মানসপটে ভেসে আসে তোমার সেই চির চেনামুখটি। মনে হয়না তুমি আমাদের মাঝে নেই। আমরা ভুলিনি তোমাকে, ভুলতে পারবো না কোন দিন। ভাই, তোমার সকল শূণ্যতা আজ উপলব্ধি করি। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে পারি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার আত্মার অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া (বগীর বাড়ী) পো: অ: রাঙ্গামাটিয়া
থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২৫৯/২২

সুখবর সুখবর সাহিত্য প্রতিযোগিতা- ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সুধী,
প্রতি বছরের মত এবছরও এপিসকপাল যুব কমিশন সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। শ্রেণি ভিত্তিক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিম্নে দেওয়া হলো।

ক-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (১ম-৩য় শ্রেণি) **বিষয়:** "পরিবার" **ছড়া:** (কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই) **পোস্টার:** ভালো অংকন কাগজ।	**খ-বিভাগ:** স্কুল পর্যায়ে (৪র্থ-৫ম শ্রেণি) **বিষয়:** সুন্দর পরিবেশ ও আমি। **কবিতা:** (কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই) **পোস্টার:** ভালো অংকন কাগজ।
গ-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) **বিষয়:** পরিবার ও দেশের প্রতি ভালবাসা **ছোটগল্প:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	**ঘ-বিভাগ:** স্কুল পর্যায়ে (৯ম-১০ম শ্রেণি) **বিষয়:** "মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন।" **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
ঙ-বিভাগ: কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে **বিষয়:** **প্রযুক্তির নেশা নয়, চাই মুক্তি ও আলোকিত মানুষ হওয়ার নেশা।** **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	**চ-বিভাগ:** অভিভাবক ও সর্ব সাধারণ **বিষয়: ঈশ্বরের ভালবাসা এবং জীবিত খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, সুন্দর জীবনের চেতনা জাগায়।** **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(১) ছোটগল্প, প্রবন্ধ, একাঙ্কিকা ও ছড়া সাদা কাগজের একপিঠে ও চারিদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কালো কালি দিয়ে লিখতে হবে।
(২) অন্য ধরণের কাগজ, উভয় পিঠে লেখা, পেন্সিল দিয়ে লেখা ও মার্জিন ছাড়া লেখা গ্রহণ করা হবে না।
(৩) নির্ধারিত একটি বিভাগের তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন দুইটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
(৪) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটোসহ আলাদা পৃষ্ঠায় প্রতিযোগিকে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত তথ্যগুলি উল্লেখ করতে হবে- বিভাগের নাম (ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ উল্লেখ করুন)। বিষয়: (প্রবন্ধ/গল্প/একাঙ্কিকা/ছড়া/পোস্টার)। লেখার শিরোনাম, প্রতিযোগির পুরোনাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), পিতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), মাতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), ডাক যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, শ্রেণি, প্রধান শিক্ষকের বা অধ্যক্ষ (বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান)- এর স্বাক্ষর ও সীলমোহর। "চ" বিভাগ পর্যায়ে বিভাগের নাম, বিষয়, লেখার শিরোনাম, প্রতিযোগির পুরোনাম, পিতার নাম বাংলায় ও ইংরেজীতে, ডাক যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, পেশা উল্লেখ করতে হবে।
(৫) প্রতিযোগিতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
(৬) লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। [লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে যা 'যুব দৃষ্টি' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হবে]।
(৭) প্রতিযোগিতায় প্রতি বিষয়ে পুরস্কারের মূল্যমান নিম্নরূপ:

পর্যায়	ক-বিভাগ	খ-বিভাগ	গ-বিভাগ	ঘ-বিভাগ	ঙ-বিভাগ	চ-বিভাগ
প্রথম	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা	১৩০০ টাকা	১৩০০ টাকা
দ্বিতীয়	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা
তৃতীয়	৫০০ টাকা	৫০০ টাকা	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা

(৮) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর পুরস্কারের টাকা নগদ দেয়া হবে এবং সঙ্গে একটি করে আর্কষণীয় প্রশংসাপত্র দেয়া হবে। অন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ৫০% ও তার অধিক নম্বর পাবেন তাদেরকেও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হবে।
(৯) প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কার সম্বন্ধে প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগিকে মোবাইলে বিস্তারিত জানানো হবে। এছাড়াও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের যে সমস্ত 'ত্রৈমাসিক যুব দৃষ্টি' পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাতে চোখ রাখুন সারা বছর।
(১০) এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক মণ্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
(১১) প্রতিযোগিতায় পাঠানো লেখা ই-মেইল/ডাক অথবা সরাসরি হাতে পাঠাতে পারেন। আমাদের কাছে পাঠানো যে কোন লেখা অ-ফেরত যোগ্য।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
বরাবর, সম্পাদক
ত্রৈমাসিক "যুব দৃষ্টি" এপিসকপাল যুব কমিশন
সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৩২০০৫০৪৫, ০১৭৪৩৪৫২৮০০

বিজ্ঞ/২৫৭/২২

First Death Anniversary
of our Beloved Mother

Margaret Gomes

(1937-2021)

Quietly remembered everyday…
No Longer in our life to share, but in our hearts, dear Mother you are always there.

Your Loving Family
Ripon Gomes, Tina Felobina Costa,
Rayana Margaret Gomes & Family

বিজ্ঞ/২৫১/২২

এডভোকেট এডমন্ড গমেজ

জন্ম: ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।'

আমাদের বাবা স্বর্গীয় এডভোকেট এডমন্ড গমেজ গত ১৮ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দে খুব ভোরে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের (I.C.U.) হাই ডেনসিটি ইউনিট (H.D.U.) এর ১ নম্বর বেড থেকে তার দুই ছেলে ও এক ছেলে বউ, তিন মেয়ে ও তিন মেয়ে জামাই, তিন ভাই, তিন ভাই বউ, ছয় বোন, তিন বোন জামাই, ৫ নাতি, ২ নাতনী, ১ নাতি বউ, ১ পুতিন এবং সকল আত্মীয় স্বজন সহ অসংখ্য শুভকাঙ্খীদের কাঁদিয়ে শ্বাস কষ্টসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ধরণের জটিলতায় সকলেরই অজ্ঞাতে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তিনি গত কয়েক মাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন এবং অন লাইন চিকিৎসায় সেবা নিচ্ছিলেন। বিগত ৩০ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৬:৩০ মিনিটে তার হঠাৎ করেই প্রবল খিঁচুনী শুরু হয় এবং তাকে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে পরবর্তীতে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ভর্তি করানো হয় এবং এই হাসপাতালের ভিতরেই বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমাদের রত্নগর্ভা স্বর্গীয়া মা এবং আমাদের আদর্শ বাবা তাদের ভালবাসার ৫ সন্তানদের পরম যত্নে, আদর্শে এবং কড়া শাসনে মাষ্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন পরে তাদের দুই ছেলে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীধারী, মেজো মেয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ আরও উচ্চতর পড়াশুনা এবং বড় মেয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ করেছেন।

স্বর্গীয় এডমন্ড গমেজ ২৯ মে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয়া ভেরোনিকা গমেজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ন। কর্মজীবনে ধরেন্ডা, নাগরীর বিভিন্ন স্কুলে, তিতাস গ্যাস ফিল্ড, জাতিসংঘসহ প্রায় ১৩টি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন পরে তিনি আইন ব্যবসায় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বনামধন্য এডভোকেট হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আমাদের বাবা ধনী গরীব সকলকে খুবই ভালবাসতেন, অত্যন্ত মিশুকে, কঠোর পরিশ্রমী, ধর্মভীরু, অতিথিপরায়ন, দানশীল, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ইংরেজি ভাষায় এবং জমি সংক্রান্ত আইনে অনেক দক্ষ ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন এবং তাদের বাল্যকাল হ'তেই লেখাপড়ায় উৎসাহ, গির্জা-প্রার্থনা করা, মিতব্যয়ী হ'তে, পরিশ্রমী হ'তে এবং সঞ্চয়ের এর বিষয়ে সবসময় শিক্ষা দিয়ে যেতেন। হে সর্বশক্তিমান প্রভু আমাদের বাবাকে অনন্ত বিশ্রাম দাও।

ধন্যবাদান্তে,
শোকার্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন

বিজ্ঞ/২৫২/২২

প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE- 33
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ৩৩
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 September, 2022, ২৭ ভাদ্র - ২ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

"দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন"

বাবা,

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল। আজও মনে হয় তুমি আমাদের মাঝে রয়েছ। বাবা তোমার চলে যাওয়াতে তোমার না থাকার এই শূণ্যতাকে আমরা আজও প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মঠ। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্বর্গসুখ দান করেন। তুমি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো বাবা, আমরা যেন তোমার আদর্শ নিয়ে একত্রে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে পারি এবং মার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যেতে পারি।

প্রয়াত হিলারিশ মঙ্গলা গমেজ
জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নন্দা, সরকার বাড়ি।

পরিবারের পক্ষে

তোমার স্ত্রী	-	ডরথী গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ	-	বাবলু ও মালা গমেজ
বড়মেয়ে ও জামাই	-	অনিতা ও শংকর কস্তা
মেঝ মেয়ে ও জামাই	-	জাসিন্তা ও মানিক রোজারিও
ছোট মেয়ে ও জামাই	-	জেনি ও রেন্ডি গমেজ
নাতি ও নাতনি	-	সেভিও-রায়েন, দিবা-স্ট্যানলি-অস্টিন, এনথিয়া-সিনথিয়া ও জেভিয়ান।

বিজ্ঞ/২৪৯/২২

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিশপীয় কমিশনসমূহের প্রধান পদে কিছু রদবদল
(কার্যকরী ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

	কমিশনের নাম	প্রেসিডেন্ট/চেয়ারম্যান
১	উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ জের্ভাস রোজারিও
২	স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি
৩	বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড ট্রাস্ট	আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই
৪	ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও
৫	সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী
৬	পরিবার জীবন বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ
৭	ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ জের্ভাস রোজারিও
৮	কারিতাস বাংলাদেশ	বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী
৯	যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু
১০	বিশপীয় যুব কমিশন	আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
১১	সেমিনারী বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও
১২	ভক্ত-জনগণ বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ
১৩	খ্রিস্টীয় একতা ও আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
১৪	মঙ্গলবাণী প্রচার ও পোপীয় সংস্থা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু
১৫	ঐশতত্ত্ব বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	বিশপ জের্ভাস রোজারিও
১৬	বিশ্বাস সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বিশপীয় কমিশন	আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই

ঘোষণাক্রমে,
বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি
জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org